



## E-BOOK

# অশনি সংকেত



— বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

নদীর ঘাটে ভালগাছের গর্দড়ি দিয়ে ধাপ তৈরী করা হয়েছে। দুটি শ্রীলোক শ্রানরতা। একটি শ্রীলোক অপেক্ষাকৃত অপব্যয়সী। গ্রিশের সামান্য কিছু নিচে হয়তো হবে। অপরটি প্রোটা।

প্রোটা বললে—ও বামুন-দিদি, ওঠো—কুমীর এয়েচে নদীতে—

অপরা বধুটির উঠবার ইচ্ছে নেই জল থেকে ওত তাড়াতাড়ি। সে কোনো জ্বাব না দিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়ে রইল।

—বামুন-দিদিকে নিয়ে আর কক্ষনো যদি নাইতে আসি !

—রাগ কোরো না পর্দটির মা—সত্যি বলচি জলে নামলে আমার আর ইচ্ছে করে না যে উঠি—

—কেন বামুন-দিদি ?

—যে গায়ে আগে ছিলাম সেখানে কি জলকষ্ট। সে যদি তুমি দেখতে ! একটা বিল ছিল, তার জল যেতো শূন্যকরে। জন্টি মাসে এক বার্নাতি জলে নাওরা, অথচ তার নাম ছিল পশ্মবিলা—

বধুটি হি হি করে হেসে ঘাড় দু'লিয়ে বললে—পশ্মবিলা ! দ্যাখো তো কি মজা পর্দটির মা ? চন্টর মাসে জল বায় শূন্যকরে। নাম পশ্মবিলা—

এই সময় একটি কিশোরী জলের ঘাটে নামতে নামতে বললে—অনঙ্গ-দিদি, তোমার বাড়ীতে কল তেল দিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে—শীগুংগর যাও, আমার বলছিল, আমি বললাম ঘাটে যান্টি—ভেকে দেবো এখন—

অনঙ্গ-বোবের হাসি তখনও থামে নি। সে বললে—তোমার বৌদিদির কাছে গল্প করছি পশ্মবিলা—জল থাকে না চন্টর মাসে—নাম পশ্মবিলা—

মেরোটি বললে—সে কোথায় অনঙ্গ-দি ?

—সেই যেখানে আগে ছিলাম—সেই গায়ে—

—সে কোথায় ?

—ভাতছালা বলে গাঁ। অন্বিকপূরের কাছে—

—তোমার বশুরবাড়ী কুঝি ?

—না। আমার বশুরবাড়ী হরিহরপুর, নদে জেলা। সেখানে বহু চলা-চলতির কষ্ট দেখে সেখান থেকে বেরুলাম তো এলাম ওই পশ্মবিলায় গায়ে—

—তারপর ?

—তারপর সেখান থেকে এখানে।

অনঙ্গ জল থেকে উঠে বাড়ী চলে গেল।

গ্রামখানিতে এরাই একমাত্র রাক্ষণ-পরিবার, আর সবাই কাপালী ও গোয়াল। নদীর ধারে এ-গ্রাম বেশি দিনের নয়। বসিরহাট অঞ্চলের চাষী, জমি নোনা লেগে নষ্ট হওয়াতে সেখান থেকে আজ বারো-তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরের এই অনাবাদী পতিত জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে গ্রামখানা বসিয়েছিল। তাই এখনও এর নাম নতুন গাঁ, কেউ কেউ বলে চর পোলতার নতুন পাড়া।

অনন্দের বাড়ী গোমালপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটে ঘর। খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েছে কাঁচ দিয়ে, রান্নাঘরের পশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ।

অনন্দের এসে দেখল বাদিনাথ কল্ বড় একটা ভাড়ে প্রায় আড়াই সের খাতি সর্ষে-ভেল এনেছে। ভেল মাপা হয়ে গেলে বাদিনাথ বললে—মা-ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি ?

—উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই ভেলে এক মাস চলে যাবে—

—আর পরমা ছটা ?

—কেন খোল তো নিয়েচ, আবার পরমা কেন ?

—ছটা পরমা দিতে হবে সর্ষে ভাঙানির মজুতির। খালের আর কত দাম মা-ঠাকরুণ।

তাতে আমাদের পেট চলে ?

—আচ্ছা উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো।

অনন্দের বোয়ের দুটো ছিল। বড়টির বয়েস এগারো বছর, তার ডাকনাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছিলে—এ সব ভারতরকারীর ক্ষেত সে-ই করেছে বাড়ীতে। এখন সে উঠানের একপাশে বসে বেড়া বাঁধবার জন্যে বাঁশের বাখারি চাঁচিছিল। ওর মা বললে—পটলা, ওসব রাখ, এত বেলা হোল, দুধ দেয় নি কেন দেখে আস তো ?

পটল বাখারি চাঁচতে চাঁচতেই বললে—আমি পারবো না।

—পারবি নে তো কে যাবে ? আমি যাবো দুধ আনতে সেই কেঁচনাসের বাড়ী ?

—আহা, ভারি তো বেলা হয়েছে, এখন বেড়াটা বেঁধে নিই, একটু পরে দুধ এনে দেবো—

—না এখুনি যা।

—তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবা বাড়ী এলে আর বেড়া বাঁধতে পারবো না। এই দ্যাখো ছাগল এসে আজ বেগুন গাছ খেয়ে গিয়েছে।

খোকা এসে বললে—মা, আমি দুধ আনবো ? দাদা বেড়া বাঁধুক—

অনন্দের সে কথা গায়ে না মেখে বললে—খোকা, গাছ থেকে দুটো কাঁচা ঝাল তোল তোদের মর্দি মেখে দি—

খোকা জেদের সুরে বললে—আমি দুধ আনবো না মা ?

—না।

—কেন আমি পারি নে !

—তোকে বিশ্বাস নেই—ফেলে দিলেই গেল।

—তুমি দিয়ে দ্যাখো। না পারিলে কাল থেকে আর দিও না।

—কাল থেকে তো দেবো না, আজকের দু'সের দুধ তো বালির চড়ায় গড়াগড়ি থাক !

তোর সর্দির করবার দরকার কি বাপু ? দুটো কাঁচা ঝাল তুলতে বললাম, তাই তোল।

এমন সময়ে পটলের বাবা গঙ্গাচরণ চক্ৰিত্তি বাড়ী ঢুকে বললে—কোথায় গেলে—এই মাছটা ধরো, দীনু তঁাওর দিনে, বললে সাত-আটটা মাছ পেয়েছি—এটা ব্রাহ্মণের সেবার লাগুক। বেশ বড় মাছটা—না ? এই পটলা পড়া গেল, শুনো গেল, ও কি হচ্ছে সকলবেলা ?

পটল মৃদু প্রতিবাদের নাকিসুরে বললে—সকালবেলা বৃষ্টি ? এখন তো দৃপ্ত হয়ে এল—

—না, তা হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কাঁচ নিয়ে থাকে না রাতদিন !

—ছাগল যে বেগুন গাছ খেয়ে যাচ্ছে ?

—যাক গে খেয়ে । উঠে অয় ওখান থেকে । ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কী কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত ?

অনঙ্গ বললে—কেন ছেলেটার পেছনে অমন করে লাগছ গা ? বেড়া বাঁধছে বাঁধুক না ? ছুটির দিন তো ।

গঙ্গাচরণ চক্ৰান্তি বললে—না, ও সব শিক্ষে ভাল না । ব্রাহ্মণের ছেলে, ও রকম কি ভালো ? পটল নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়া বাঁধা রেখে উঠে এল ।

অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো, একবার হরিহরের হাতে যাও না ।

—কেন ?

—একবার দেখে এসো নতুন গাড়ি উঠলো কিনা ।

—সে তুমি ভেবো না, আমার গাড়ি কিনতে হবে না । এখান থেকেই পাওয়া যাবে । সবাই ভীতি করে ।

বাইরে থেকে কে ডাকলে—চক্ৰান্তি মশায়, বাড়ী আছেন ?

গঙ্গাচরণ বললে—কে রামলাল ? দাঁড়াও—

আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই বেঁকা যায় । গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে আসতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো ?

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—অমন করে হাত দেখে না । বসো, ঠান্ডা হও । হেঁটে এসেচ, নাড়ী চপ্পল হবে বে । বাপ, এ কোদাল-কোপানো নয় ! এসব ডাক্তার-বন্দির কাজ, বসে ঠান্ডা মাথায় করতে হয় । কাল কেনন ছিলে ?

—রাগিত্তে জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর যেন ভারী পাথর—

—কি খেয়েছিলে ?

—দুটো ভাত খেয়েছিলাম চক্ৰান্তি মশাই, আর কি খাবো বলুন, তা ভাত মন্থে ভাল লাগলো না ।

—যা ভেবেছি তাই । ভাত খেলে কি বলে ? জ্বর সারবে কি করে ?

—আর খাবো না ।

—সে তো বৃন্দলাম—যা খেয়ে কেলেচ, তার ঠ্যালা এখন সামলাবে কে ? বোসো, দুটো বাড়ি নিয়ে যাও—শির্ডলপাতার রস আর মধু দিয়ে খেও, স্যাখো কেমন থাকো—

ওষধ নিয়ে রামলাল চলে যাচ্ছিল, গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবার নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেত ? দুকঠা পাঠিয়ে দিও তো । আমি বাজারের তেল খাইনে বাপ, সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ী থেকে ভাঙিয়ে নিই ।

—যে আঞ্জে । আমার ছেলে ওবেলা নিয়ে যাবেখন । তেমন সর্ষে এবার হয় নি চক্ৰান্তি মশাই । বিস্ট হওয়াতে সর্ষে গাছে পোকা ধরে গেল কার্তিক মাসে ।

রামলালকে বিদায় দিয়ে গঙ্গাচরণ সর্ষে শ্রীর কাছে বলল—দেখলে তো ? যাকে যা বলবো, না বলুক দাঁক কেউ ? সে জো নেই কারো ।

স্বামীগর্বে অনঙ্গ-বোয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আদরের সুরে বললে—এখন নেয়ে নাও দিকি? বেলা তেতাপরে হয়েছে। সেই কখন বেরিয়েচ—দুটো ছোলা-গড় মুখে দিগে নাও—এখুনি তো তোমার ছাত্তরের দল আসতে শুরু করবে। তেল দিই—

নদীতে স্নান সেরে এসে জলখাবার অর্থাৎ ছোলা ভিজ়ে ও এক টুকরো আখের পাটালি খেতে খেতে গঙ্গাচরণের মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। অনঙ্গ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁগা, পাঠশালা খোলার কথা কিছ, হোল বিশ্বেস মশায়ের সঙ্গে?

—সব হয়ে যাবে। ও'রা নিজেরা ঘর বেঁধে দেবেন বললেন—

—ছেলে হবে কি রকম?

—দুটো গায়ের ছেলেমেয়ে পাঁচ—তাছাড়া প্রাইভট পড়ার ছাত্তর তো আছেই হাতে। এ দিগরে লেখাপড়া জানা লোক কোথায় পাবে ওরা? সকলের এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েছে হাতে জামি থাকি।

—সে তো ভালই। উড়ে উড়ে বেড়িয়ে কি করবে—এখানেই থাকা যাক। আমার বন্ড পছন্দ হয়েছে। কোন জিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি—

—রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটারদের। চাষা গা, জিনিস বলা পত্তর বলা, ডাল বলা, মুলো বেগুন বলা—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গায়ে পুরুত নেই ওরা বন্ধে, চক্ৰিত মশাই, আমাদের লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজোটাও কেন আর্পান করুন না?

—সে বাপু আমার মত নেই।

—কেন—কেন?

—কাপালীদের পুরুর্তাগরি করবে? শূদ্দুর-যাজক বামন হোলে লোকে বলবে কি?

—কে টের পাচ্ছে বলা? এ অজ পাড়াগায়ে কে দেখতে আসচে—তুমিও যেমন!

—কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো? না ছেনে পুজো-আচ্চা করা—ওসব কাঁচা-খেবো দেবতা, বন্ড ভয় হয়। ছের্দোপলে নিয়ে ঘর করা—

—অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্ঠীপুজো মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হবে।

—তুমি যা বোঝো—

—কোনো ভয় নেই বো—তুমি দেখে নিও, এ ব্যাটারদের সব দিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে।

অনঙ্গও তা জানে। স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু কথা তা নয়—এক জায়গায় টিকে থাকতে পারলে সব হতে পারে, কিন্তু স্বামীর মন উড়ু-উড়ু, কোনো গায়ে এক বছরের বেশি তো টিকে থাকতে দেখা গেল না। বাসুদেবপুরেই বা মন্দ ছিল কি? একটু সুবিধে হয়ে উঠতে না উঠতে উর্ন অর্মান বনলেন—চলো বো, এখানে আর মন টিকচে না।

অমন করে উড়ে উড়ে বেড়ালে কি কখনো সংসারে উন্নতি হয়? তবে একথা ঠিক বাসুদেবপুরে শূদ্দু পাঠশালায় ছেলেপড়ানোতে মাসে আট-দশ টাকা আয় হত।—আর এখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কত! উন্নতি হয় তো এখান থেকেই হবে। উর্ন যদি মন বসিয়ে থাকেন তবে সবই হতে পারে সে জানে।

একটু পরে চার-পাচটি ছোট ছোট ছেলে শ্রোত বই নিয়ে দাঁড়বাঁধা দোয়াত ঝুঁনিয়ে গঙ্গাচরণের কাছে পড়তে এল।

গঙ্গাচরণ বললে, আমি এই খেয়ে উঠলাম, একটু শূয়ে নিই—তোরা পুরোনো পড়া দাখ ততক্ষণ। ওরে নন্দ, তোদের বাড়ীতে বেগুন হয়েছে?

একটি ছোট ছেলে বললে—হ্যাঁ গুরুমশায়—

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—গুরুমশায় কি রে? সারু বলবি। শিখিয়ে দিইচি না? বল—

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—হ্যাঁ সারু—

—যা গিয়ে বসে লিখগে—বেগুন নিয়ে আসবি কাল, ঝুঁনি ?

—আনবো সারু।

ছেলে কটি দাড়ায় বসে এমন চীৎকার জুড়ে দিলে যে তাদের স্ত্রী-সমীচায় করো নিদ্রা বা বিগ্রাম সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো তোমার ছাবরেরা যে কানের পোকা বের করে দিলে। ওদের একটু খামিয়ে দাও—

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! পড়া থাক এখন, সবাই শটকে কড়ংকে লিখে রাখ শেলেটে। আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখবো।

তারপর স্ত্রীকে ঝুঁনির সুরে বললে—ছটা হয়েছে, আরও সাত-আটটা কাল আসছে পুবে পাড়া থেকে। ভূমি ঘেঁষ বলছিল, বাবাঠকুর, আমাদের পাড়ার সব ছেলে আপনার কাছে পাঠাবো। নেতা কাপালীর কাছে পড়লে যদি ছেলে মানুষ হোত, তা হোলে আর ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ হোল সমাজের সব কাজের গুরুমশায়। কথায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

গঙ্গাচরণ মন দিয়ে ছেলে পড়ায় বটে। ঘুম থেকে উঠে সে ছেলেদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইল—কাউকে নামতা পড়ায়, কাউকে ইংরেজী ফার্স্ট বুক পড়ায়—ফার্সি বাজ গুরুমশায় কেউ তাকে বলতে পারবে না। বেলা বেশ পড়ে গেলে সে ছাত্রদের ছুঁট দিয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে বেরবার উদ্যোগ করতে অনঙ্গ এসে বললে—ওগো, কিছুর খেয়ে যাবে না—আজ দু'বাড়ী থেকে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল, একটু স্কীর করেচি...

বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃশ্টে ঘটে নি।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে আজ তিনটি বছর কাটতে স্বামী-স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর কথা গঙ্গাচরণের কানে একটু নতুন শোনালো।

স্ত্রীকে বললে—ছেলেদের দিয়েচ?

—সে ভাবনা তো তোমার করতে হবে না, তুমি খেয়ে নাও—

খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে স্ত্রীকে বললে—এখানে আঁছ ভালই, কি বল?

অনঙ্গ-বোয়ের মুখে সমর্থনসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, সে কোনো উত্তর করল না।

লক্ষ্মীর রূপা যদি হয়ই, মুখে তা নিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।

গঙ্গাচরণ ঋণিকটা স্কীরসম্ব বাটিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে—এই নাও—

—ও কি! না-না—সবটা খেয়ে ফেল—

—তুমি এটুকু—

—আমার জন্যে আছে গো আছে, সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না—

—তা হোক। আর খাবো না—এবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ীমাই। পাকাপাকি করে আসি।

—বেশ দেরি কোরো না—এখানে নাকি বুনো শূওর বেয়েল সন্দের পর। আমার বড় ভয় করে বাপু—

গঙ্গাচরণ ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়ে গম্বুবাহানে বেতে বেতে কংপনাচকে তার ভাবিয়াং গৃহস্থালীর ছবি আঁকছিল। বেশ লাগে ভাবতে। এই সব মাঠে ভাল চাষের জমি পাওয়া যায়, যদি কিছু জমি তাড়ংগাড়ার বাড়ীমো জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়ার যোগাযোগ ঘটে, যদি বিশ্বাস মশায়কে বলে করে একখানা লাঙল করা যায় তবে জাত-কাপড়ের ভাবনা দূর হবে সংসারের।

অনেকদিন থেকে সে-জিনিসের ভাবনাটা চলে আসছে।

হয়তো ভগবান ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসে ফেলছেন এতদিনে।

বিশ্বাস মশায়ও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন গঙ্গাচরণকে এ-গ্রামে বসাবার জন্যে। বললেন—  
আপনারা আমাদের মাথার মার্গ—আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত আপনি করে দিন—

—সব হয়ে যাবে—আপাতত যাতে আপনার চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে তো? বাড়ীতে খেতে ক'জন?

—আমার শ্রী ও দুটি ছেলে—

বিশ্বাস মশায় মনে মনে হিসেব করে বললেন—ধরুন মাসে দশ আড়ি ধান—পনেরো কাঠা চাল হলে আপনার মাস চলে যাবে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, তাই ধরুন—

—আর সংসারের ডালডুল, তেল নুন—ও হয়ে যাবে। পরদূর্তিগরিটাও ধরুন—

—সে তো ঠিক করেই রেখেছি—সংস্কৃত জিনিসটা কষ্ট করে শিখতে হয়েছে—ও বড় শত্রু জিনিস, সকলের মূখ দিয়ে কি বেরায়? এই শূন্য তবে—ধার্ম্যমত্যং রজতগরিণিতং চারুচন্দ্রাবতং—ইয়ে—পরশুদুংগবরা ভীতিহস্তা—ইয়ে রতকংপজ্জলাং—

—ব্যাং, ব্যাং—

—এটা কি বলুন তো?

—কি করে জানবো বলুন—আমরা হাঁড়ি চাষীবাসী গেরস্ত, আংক আংক পর্যন্ত আমাদের বিনো। আর শিশুবোধক। পড়েছেন শিশুবোধক?

পাখী সব করে রব রাত পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল—

নেখন কদিন আগে পড়েছি, ভুলি নি। সব মনে আছে।

গঙ্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন—বেশ—বেশ—

বিশ্বাস মশায় হৃষ্টমনে বললেন—বাবা মারা গেলেন অংপ বয়সে। সংসারে দুটি নাবালক ভাই—জমিজমা যা ছিল এক জরীত খড়ো সব নিজের বলে লিখিয়ে নিলে জরিপের সমন—

—সে কোথায়?

—চন্দ্রাপুর, ডাবতলীর কাছে। ডাবতলীর গরুর হাট ও-দিগরে নামকরা। অত বড় গরুর হাট এ জেলায় নেই।



—সেখান থেকে বৃষ্টি এখানে এলেন ?

—হ্যাঁ, দেখলাম ও গায়ে আর স্বেদে হবে না। মনে মনে বললাম, মন, পৈতৃক ভিত্তিরে মায়া ছাড়। এখানে কি না খেয়ে মরবো? আমি আর বিণ্টু সা। বিণ্টু সা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে গাঁ ছেড়ে যেতে রাজী হোল। তখন ঝড়তে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। এ বলে ওখানে জমি সস্তা, ও বলে ওখানে জমি সস্তা। কিন্তু মশায় জমি পাওয়াই যায় না। সস্তা তো কোথাও দেখলাম না। পণ্ডাশ টাকার কমে কোথাও জমি নেই—

—ধানের জমি—

বিশ্বাস মশায়ের অশ্রমহলে এই সময় শাকি ফুঁ পড়লো, গঙ্গাচরণ বাস্তবমস্ত হয়ে উঠে বললে—ও, সন্দেহ হয়ে গেল—আমি এবার যাই—এবার সন্দেহ-আহিক করতে হবে কিনা ?

আসল কথা, শ্রীর বনো-শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণী তার মনে পড়েচে। নতুন গায়ের আশেপাশে এখনও যথেষ্ট বনজঙ্গল, অশ্রমকারে চলাফেরা না করাই ভালো। সাবধানের মার নেই।

বিশ্বাস মশায় বললেন—তা ষিলক্ষণ! এখানে আমার এই বাইরের ঘরেই সন্দেহ-আহিকের জায়গা করে দিই। গঙ্গাজল আছে বাড়ীতে। আমরা জেতে কাপালী বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়েরা শ্নান না করে মুখে জলটুকু দেয় না—সব মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের সন্দেহ-আহিক হোলে এ বাড়ীতে, বাড়ী আমার পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর একটু জল মুখে দিন—

—না না, সে সব এখন আর দরকার নেই—যখন এখানে আছি, তখন সবই হবে—উঠি এখন—গঙ্গাচরণ খুব বাস্তব হয়ে উঠলো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—আমার গঙ্গাপতা শুনেন যান। তারপর তো—

—আচ্ছা ও আর একদিন শুনবো এখন। সন্দেহ-আহিকের সময় হয়ে গেলে আমার আর কোনোদিকে মন থাকে না। ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত পড়িচি—নিত্যকর্মগুলো তো ছাড়তে পারবো না—

গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর ভাঁজতে গদগদ হয়ে উঠলো।

গঙ্গাচরণের পাঠশালা বেশ জমে উঠেছে।

আজ সকালে সাত-আটটি নতুন ছাত্র দাড়ি-বাঁধা মাটির দোরাত হাতে ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত। গঙ্গাচরণ তাদের নিয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত বাস্তব রইল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই স্থূলবৃষ্টি, এদের বাপ-ঠাকুরদাদা কখনও নিভের নাম লিখতে শেখে নি, জমি চষে কলা বেগুন করে জীবিকানিবাহ করে এসেচে, লেখাপড়া শেখাটা এদের বংশে একেবারে অভিনব পদার্থ।

গঙ্গাচরণ বললে, সকাল থেকে চেষ্টা করে ক'য়েক আঁকুড়ি দিতে শিখালি নে? তা শিখাবি কোথা থেকে? এখন ওসব আঙুল সোজা হ'তে ছ'মাস কেটে যাবে। লাঙলের ম'ঠি ধরে ধরে আড়ম্ব হয়ে আছে বে। এই ভূতো, যা একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি! রাগায়েরে তোর কারিকমার কাছ থেকে আগুন নিয়ে আয়—

দুটি ছাত্র ছুটলো তখন আগুন আনতে।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! যাবার দরকার কি তোমার?—ভূতো একাই পারবে।

অন্য একটি ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তোরা বাবা বাড়ী আছে ?

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ সার—

—কাল যেন আমরা এসে কামিয়ে যায় বলে দিস্—

—সার, বাবা কাল ভিন্‌গায়ে কামাতে গিয়েছে।

—এলে বলে দিস এখানে যেন আসে।

অনঙ্গ-বৌ ডেকে পাঠালে বাড়ীর মধ্যে থেকে।

গঙ্গাচরণ গিয়ে বললে—ডাকছিলে কেন ?

অনঙ্গ বললে—শুধু ছেলেদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে ? কাঠ ফুরিয়েছে তার ব্যবস্থা দ্যাখো—

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হবার সুরে বললে—সে কি ? এই যে সেদিন কাঠ কাটিয়ে দিলাম এক-গাড়ী। সব পুড়িয়ে ফেললে এর মধ্যে ?

অনঙ্গ রাগ করে বললে—কাঠ কি খাবার জিনিস যে খেয়ে ফেলেচি ? রোজ এক হাঁড়ি ধান সেশ হবে, চিঁড়ে কোটা হোল দশ-বারো কাঠা—এতে কাঠ খরচ হয় না ?

অনঙ্গ কথাটা একটু গর্ব ও আনন্দের সুরেই বলল, কারণ সে যে দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে, সেখানে একদিনে এত ধানের চিঁড়ে কোটারূপ সচ্ছলতা স্বপ্নের বিষয় ছিল—যে-দারিদ্রের মধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম স্বশুরবাড়ী এসে, এখন সে-কথা ভাবতেও যেন পারা যায় না।

বাসুদেবপুর এসে আগের চেয়ে অবিশ্য অবস্থা ভালই হয়েছিল। তবে সে গ্রামে শুধু পাঠশালার ছেলে পড়ানোর আয় ছিল সম্বল, জিনিসপত্র কেউ দিত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখনও বাসুদেবপুর নিয়ে কথা ওঠে।

সেদিনই দুপুরের পর আহা়ারান্তে গঙ্গাচরণ একটু বিশ্রাম করছিল, অনঙ্গ এসে বললে—বাসুদেবপুর আবার যাবার ইচ্ছে আছে ?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—কেন বল দিকি ?

—না তাই বলিচি। সেখানকার ঘরখানা তো এখনও রেখেই দিয়েচ, বিক্রি করেও তো এলে না।

—তখন কি জানি এখানে বেশ জমে উঠবে ?

—ভাতছালার জন্যে কিন্তু মন কেমন করে। সেখানকার পশ্মবিলের কথা মনে আছে ?

—পশ্মবিল তো ভালই ছিল। বেশ জল।

—চাঁদের মাসে জল থাকতো না বটে, কিন্তু না থাকুক বাপু, গাখানার লোকগুলো ছিল বহু ভাল। তিনদিকে মাঠ, একদিকে অতবড় বিল, সুন্দর দেখতে ছিল।

—তুমি তো বলেছিলে পশ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবে।

—ভেবেছিলাম নতুন খড় উঠলেই পশ্মবিলের ধারে ঘর তৈরি করবো। লোকজনকে বলেও রেখেছিলাম। সস্তায় খড় দিত।

অনঙ্গ আপন মনে হিসেব করার ভাঁপতে বললে আঙুল গুলে গুলে—হরিহরপুরে বিরে হোল। সেখান থেকে ভাতছালা, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর এখানে। অনেক দেশ বেড়ানো হোল আমাদের—কি বলো ?

গঙ্গাচরণ গর্বের সুরে বললে—বালি হরিহরপুরে গায়ের ক'জন এত দেশ দেখে বেড়িয়েছে ?

অনঙ্গ বললে—শুধু দেখে বেড়ানো কি বলো গো ! বাসও করা হয়েছে।

—নিশ্চয়ই ।

—কিন্তু একটা কথা বাপু...

—কি ?

—এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেও না ।

—যদিপন চলা-চলাতির স্দুবিধে থাকে, থাকবো বৈকি । এখন তো বেশই হচ্ছে—বিশ্বাস মশায় এ গায়ের মোড়ল । সে যখন ভরসা দিয়েচে, তখন আর ভয় করি নে—

—তা তো ব্দুখলাম, কিন্তু তোমার যে মন টেকে না কোথাও বেশদিন ।

—হাতে পয়সা এলেই মন টিকবে । তা ছাড়া দিবিা নদী—

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করে একবার ভাতছালা দেখতে ।

—তা একবার গেলেনই হয় । গরুর গাড়ীতে একদিনের রাস্তা । বিশ্বাস মশায়ের কাছে বসলেই গরুর গাড়ী দিতে পারে ।

অনঙ্গ আগ্রহের সংগ বললে—হ্যাঁগা তা বলো না । বলবে একবার বিশ্বাস মশায়কে ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কেন ? ভাতছালা যাবার ধুব ইচ্ছে ?

—খু-উ-ব ।

—তুমি তাহোলে পটল আর খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো একদিন ।

—কেন তুমি ? -

—আমার পাঠশালার ছুটি কই ? আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে ।

—কতকাল যাই নি ভাতছালা । চার বছর কি পাঁচ বছর । ভাতছালার বিনি নাপতিনীকে মনে আছে ? আহা, কি ভালই বাসতো । আবার দেখা হোলে সেও কত খুশী হয় ! সেই আমবাগানের ধারে আমাদের ঘরখানা ।—আচ্ছা কত জায়গায় ঘর বধিলে বলো তো ?

গঙ্গাচরণে শীতের বেলা পড়ে এল । গঙ্গাচরণ উঠে বললে—যাই । একবার পাশের গায়ে যাবো । পাঠশালার জন্যে আরও ছাত্র যোগাড় করে আনি । ছাত্র যত বেশি হবে ততই স্দুবিধে ।

—একটু কিছ্ু জল খেয়ে যাও—

গঙ্গাচরণ আহ্লাদে হেসে বললে—অভোস খারাপ করে দিও না বনচি । এ সময় জলখাবার খেরোঁছ কবে ?

অনঙ্গ হাসিমুখে বললে—মা-লক্ষ্মী যখন জুটিয়ে দিয়েছেন, তখন খাও । দাঁড়াও আমি আনি—

একটা পাথরের বাটিতে কয়েক টুকরো পেঁপে কাটা ও আখের টিকুলি এবং অন্য একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা সর নিয়ে অনঙ্গ-বো স্বামীর সামনে রাখলে । গঙ্গাচরণ খেতে খেতে বললে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—আচ্ছা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না ?

অনঙ্গ ঠেটি উল্টে বললে—ওঃ ! তোমার যদি হোল তো সব চাই । চা !

—কেন ?

—ওসব বড়মানুষে খায় । গরীবের ঘরে কি পোষায় ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আসলে তুমি চা তৈরী করতে জান না তাই বলো !

অনঙ্গ মুখভাঁঙ্গি করে বললে—আহা-হা !

—পারো চা করতে ? কোথায় করলে তুমি ?

অনঙ্গ এক ধরনের হাসলে, যার মানে হচ্ছে, আর ভান করে কি করবো ?

গঙ্গাচরণ বললে—কেনন ধরে ফেলোঁচ কিনা ?

অনঙ্গ প্রত্যুত্তরে আর একবার হেসে বললে—না করি, করতে দেখেঁচি তো। বান্দেব-পূরে চক্কাতি-বাড়ী চা খেঁতো সবাই। আমি গিন্নীর কাছে বসে বসে দেখতাম না বুঁকি ?

গঙ্গাচরণ পাশের গ্রামে যখন মাঠের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বেলা বেশ পড়ে এসেছে। দারাবনের তাস্তা খর রোদে উল্, ও কাশবনে ক্লেমন সন্দ্রর একটা সোঁদা গম্ব। শীতও আজ পড়েছে মন্দ নয়।

একটা লোক খেজুর গাছে মাটির ভাঁড় নিয়ে উঠে সেখে গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—বলি ও ছিদাম, একদিন খেজুর-রস খাওয়াও বাবা।

লোকটা গাছের ওপর থেকেই বললে—গুরুমশায় ? কাল সকালে পেঁটিয়ে দেবেন একটা ছেঁলে। এক ভাঁড় যেন নিয়ে যায়—

গঙ্গাচরণের মনে ষথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ এই ভেবে যে, কেউ তার কথা এখানে ঠেলতে পারে না। সবাই মানে, যার কাছে যে জিনিস চাওয়া যায়, কেউ দিতে অস্বীকার করে না। বাসুদেবপূরে এমন ছিল না, ভাতছালাতেও না।

পাশের গ্রামের কোনো নাম নেই—‘পশ্চিমপাড়া’ বলে সবাই। এর একটা কারণ—এসব গ্রাম আজ কয়েক বৎসর হল বসেছে। আগে এসব পতিত মাঠ বা অনাবাদী চর ছিল, এনেশের চাষাদের জমির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ এসে সব জঙ্গল ও নলখাগড়া ভরা পতিত জমিতে চাষ করতে রাজী নয়। অন্য জেলা থেকে কাপালী জাতীয় চাষীরা এসে এই অনাবাদী চরে সোঁদা ফালিয়েছে, এরই নতুন গ্রামগুলো বসিয়েছে—গ্রামের নামকরণ এখনও হয় নি।

পশ্চিমপাড়াতে ঢুকেই গ্রামের মণ্ডপ ঘর। বিক্লে দূ-পাচজন লোক এখানে বসে তামাক পোড়ালে।

একজন গঙ্গাচরণকে দেখে বললে—কি মনে করে দাদাঠাকুর ? পেরণাম হই। আসুন—

গঙ্গাচরণ ভড়ং দেখাবার জন্যে ফতুয়ার নিচে থেকে পৈতেটা বার করে আঙুলে জড়িয়ে হাত তুলে বললে—জয়ন্তু।

তারপর বনে একবার এদিকওঁদিক তাঁকিয়ে বললে—এটা বেশ ঘরখানা করেচ তো ? পূজো হয় ?

দলের মধ্যে একজন গঙ্গাচরণকে তামাক খাওয়াবার জন্যে কলাপাত আনতে ছুঁটলো। একজন বললে—পূজো হয় নি দাদাঠাকুর। সামনের বাবে করবার ইচ্ছে আছে—দাছা আপনি পারবেন দাদাঠাকুর ?

গঙ্গাচরণ অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে চূপ করে রইল, উত্তর দিলে না। ওতে পসার থাকে না।

ওনের মধ্যে আর একজন পূর্বের লোকটিকে ধমক দিয়ে বললে—জানিস নে শূঁনিস নে কথা বলতে যাস—ওই তো তোর লোষ। জানি জানেন না পূজো কিস্তি তো কে করবে ? উঁনি নেকাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ।

গঙ্গাচরণ ধীর ভাবে বললে—থাক থাক, ও ছেলেমানুষ...বলেচে বলচে—

ইতিমধ্যে কলার পাত এল, একজন হাঁকো থেকে কস্ক খুলে গঙ্গাচরণের হাতে দিতে যেতেই গঙ্গাচরণ বিস্মিতভাবে বললে—কি ?

—তামাক ইচ্ছে করুন—

—তোমাদের উচ্ছ্রষ্ট কলকেতে আমি তামাক খাবো ?

দলের স্বে লোকটি কস্ক এগিয়ে হাতে দিতে গিয়েছিল, সে দস্তুরমত অপ্রতিভ হোল।

তখন ওদের মধ্যে সেই বিজ্ঞ লোকটি আবার ধমক দিয়ে বললে—এ কি পাঁচুঠাকুরকে পেয়েছিছ তোরা, কাকে কি বলিস তার ঠিক নেই। নাড়ান দাদাঠাকুর, আমার বাড়ীতে নতুন কলকে আড়ায় টাঙানো আছে, নিয়ে আসি।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—হাত ধুয়ে এনা—

উপস্থিত লোকগর্দূল ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লো। হাত ধুয়ে নতুন কলকেতে তামাক সাজতে হয় যার জনো, এমন ব্রাহ্মণ সত্যি কথা বলতে গেলে তারা কখনো দেখে নি।

নতুন কস্ক আনীত হোল, নতুন কলাপাতাও। গঙ্গাচরণের হাতে ভক্তিবাবে টাটকা-সাজা তামাক এগিয়ে দেওয়া হোল।

গঙ্গাচরণ বললে—কথাবার্তা বলতে হয় বুঝে-সুজে বাপু। আমি পূজো করতে জানি না-জানি তোমরা যে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা এর কিছ বুঝবে ?

বিজ্ঞ লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—হাঁঃ, একসম অর্গ মৃগ্য !

এই কথা বলে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করে সে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাস দিন ওদের কথা। ওরা কাকে কি বলতে হয় জানে ?

গঙ্গাচরণ বললে—সে কথা যাক গে। এখন তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি জানো ?

দলের অন্য লোকেরা কথা বলতে সাহস না করতে শূন্য বিজ্ঞ লোকটিই এর উত্তরে বললে—কি বলুন দাদাঠাকুর ?

—আমি একটা পাঠশালা খুলেচি নতুন গ্রামে। তোমাদের গ্রামের ছেলেগর্দূল সেখানে পাঠাতে হবে।

—বেশ কথা দাদাঠাকুর। এ তো বুঝ ভাল—আমাদের ছেলেপিলেদের একটা হিসে হয় তা হলে—

—বুঝ ভালো। সেজন্য তো আমি এলাম তোমাদের কাছে। তুমি একবার সবাইকে বলো—

লোকটি দলের দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো সবাই দাদাঠাকুর যা বললেন ? আপনি বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে একটু পরামর্শ করি—

একটা কাঠালতলায় সকলে মিলে জোট পার্কিয়ে কি বলা-কওয়া করলে, তারপর বিজ্ঞ লোকটি আবার ফিরে এসে গঙ্গাচরণের কাছে বললো। বললে—সব ঠিক হয়ে গেলে দাদাঠাকুর—

—কি ?

—সবাই ছেলে পেটিয়ে দেবে কাল থেকে। ওনারা আর একটা কথা বলচেন—

—কি কথা ?

—আমাদের এখানে যদি পাঠশালা খোলেন তবে কেমন হয় ?

—দু'জারগায় হয় না। ও গ্রামে বাস করি, এ গ্রামে পাঠশালা—তাও হয় না।

—কত দিতে হবে আমাদের, একটা ঠিক করে দ্যান—

—আমার বাপু জোরজবরদাঙ্গি নেই, বিদ্যাদানং মহাপুণ্যং, বিদ্যানান করলে ক্ষেটি অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তবে আমারও তো চলা-চলতির ব্যবস্থা একটা চাই, এই বৃথে তে:মরা যা দাও। নিজেরাই ঠিক করো। আমার মূখে বনাটা ভালো হবে না।

গঙ্গাচরণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এভাবে অগ্রসর হলে ফল ভাল হয় সে জানে। কাজেই বাড়ীতে ফিরে অনঙ্গ যখন বললে—তা ওদের ওপর ফেলে দিলে কেন? তোমার নিজের বলা উচিত ছিল—তখন গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আরে না জেনে কি আর আমি তড় ঘটিতে গির্দেছি। আমি নিজের মূখে হয় তো বলতাম চার আনা—ওরা দেবে আট আনা—দেখে নিও তুমি।

পরদিন সকালে খেদ বিশ্বাস মশাইকে নিজের বাড়ীতে আসতে দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হেল। ছেলেকে ডেকে বললে—পটলা, ডেক্সোসোটা নিয়ে অন্ন চট করে—

ডেক্সোসো মানে একটা কেরোসিন কাঠের পুরোনো প্যাক বাস্ক। এর নাম 'ডেক্সোসো' কেন হয়েছে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা দক্ষর।

বিশ্বাস মশায় বললেন—থাক থাক—আমার জন্যে কেন—

—সে কি হয়? বসুন বসুন—তারপর কি মনে করে সকালবেলা?

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়ীতে কাল আপনি সমস্কৃতো বলেছেন, বাড়ীর মেয়েরা সব শুনতে। আমার একটা গাইগরুর আজ মাসাৰ্ঘি হলে দড়ি গলায় আটকে অপমিত্তা ঘটেচে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমার নাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দি' লেগেই আছে—বুঝলেন?

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো। ভাবটা এই রকম যে, "ও তো না হয়েই যায় না"—

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন কি করা যায়? কাল রাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উর্নি পণ্ডিত লোক, একটা হিল্পে হবে।

গঙ্গাচরণ পূর্ববং চিন্তাকুল। সংক্ষেপে শূধু বললে—হঁ—

ও'র হাবভাব দেখে বিশ্বাস মশায় ভর পেয়ে গেলেন। খুব গরুরতর কিছু ঘটবার সূত্রপাত নাকি তার সংসারে? শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেচে কি জানি? আর কিছু বলতে তাঁর সাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচ করতে হবে। বিপলে ফেলেচে।

বিশ্বাস মশায় উৎসেগের সুরে বললেন—কি রকম? কি রকম?

—গোবধ মহাপাপ। এত বড় মহাপাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এ তো আমরা ইচ্ছে করে করি নি? মাঠে কাঁধা ছিল, দড়ি গলায় কি করে আটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।

—এখন কি করা যায় তা হোলে ?

—স্বস্ত্যয়ন করণ্ড হব, সামনের আমাবস্যোর দিন যোগাড় করণ্ডে হব সব । টাকা পনেরো-কুড়ি খরচ হব ।

বিস্বাস মশায় উষ্ণ সূরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ করে দিন না ঠাকুর মশাই । গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—দেখে শূনে ফর্দ করণ্ডে হব । একটা গুরুত্ব ব্যাপার, আপনার নাস্তির অসুখ সারা না-সারা এর ওপর নির্ভর করণ্ডে । যা-তা করে দিলেই তো হব না ? দাঁড়ান একটু, আসিচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকণ্ডেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব আড়াল থেকে শূনেচে ।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গা ?—কি হয়েছে ?

গঙ্গাচরণ শ্রীক্ষে হাতছানি দিয়ে তেতরের উঠানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—বড় খন্দের । উঁন হোলেন বিস্বাস মশায় । তোমার কাপড় আছে ক'খানা ?

—আমার ?

—আঃ, তাড়াতাড়ি বল না ? তোমার না তো কি আমার ।

—আমার আটপোরে শাড়ী আছে দু'খানা, আর একখানা, তিনখানা । তোরঙ্গের মধ্যে তোলা ভালো শাড়ী আছে দু'খানা ।

—কি নেবে বলো । ভালো শাড়ী না আটপোরে ?

—ভালো শাড়ী একখানা হোলে বড় ভালো; হয়, কস্তাপেড়ে, এই—এই রকম জলচুড়ি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চর্কিত-গিল্পীর পরনে দেখে সেই পর্যন্ত বড় মনটার ইচ্ছে—হ্যাঁ গা, কে দেবে গা ?

—আঃ, একটু আশ্বে কথা বলতে পারো না ছাই ? দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে । আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে ?

অনঙ্গ ঠোঁট উন্টে তাকিল্যোর সূরে বললে—গাওয়া ঘি ? বলে ভাত পায় না, মূর্ডাকি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিস্বাস মশায়, বসিয়ে রাখলাম । কিন্তু এসব কাজ তেবে চিন্তে করে দিতে হয় । শূনে নিন—ভালো লালপাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধ সের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন । চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, মস্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দু'খানা, পেতলের খালা একখানা, ঘটি একটা, ধূনো একপোয়া...ওঃ ভুলে গিয়েচি, মধুপর্কের ঘটি একটা, আসন একটা—

বিস্বাস মশায় মন দিয়ে ফর্দ শূনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ও খালাঘটি কি নতুনই দিতে হব ? আপনার বাড়ী থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না ?

—তা হয় । তবে খুঁং না রাখাই ভালো । আপনি নতুনই দেবেন ।

—দিন ঠিক করে দিন—

—সামনের আমাবস্যায় হব, ও আর দিন ঠিক ঠিক । বলোছ তো । দাঁক্ষণে লাগণ্ডে দু'টাকা ।

বিস্বাস মশায় অনঙ্গরোধের সূরে বললেন—টাকা খরচের জন্যে অপসিত নেই—যাণ্ডে নাস্তি আমার—ঠাকুর মশাই—যাণ্ডে সেরে ওঠে—

প্রায় কানো কানো হয়ে উঠলেন উর্নি ।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললে—হঃ, গোবধ ! বলে কত কত শব্দ কাম্বুজের জন্যে শান্তি-স্বস্তায়ন করে এলাম ! কোনো ভয় নেই, যান আর্পনি ।

অনঙ্গ স্বামীর্ কৃত্তবে খুঁশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী থেকে একরাশি জিনিসপত্র বহন করে বাড়ী নিয়ে এল । একগাল হেসে বললে—দেখি শাড়ীখানা ? বাঃ, চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি ? কতটা ?

—তা আছে পার্কি তিনপোয়া । বাড়ীর তেরী খাঁটি ঘি ।

—এইবার একবার ভাতছালা বোড়িয়ে আসি, কি বলো ?

—বিশ্বেস মশায়কে বলেও এনোঁছি । গরুর গাড়ী দেবে বলেচে—

—তুমি যাবে না ?

—আমার কি সময় আছে যে যাবো ? ছেলে পড়াতে হবে না ? তুমি যাও ছেলেনের নিয়ে । এসময়ে টাকাও পেয়েচি দুটো । একটা থাক্, একটা খরচ করে এসো ।

কিন্তু যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল । তখন অনঙ্গ একদিন বিশ্বাস মশায়ের গরুর গাড়ীতে ছেলেনের নিয়ে ভাতছালা রুওনা হোল । দু'কোশ পথ গিয়ে কাঁটারিয়া নদী পার হতে হোল লোড়াখেয়া নৌকোতে গরুর গাড়ীসুখ । অনঙ্গ-বোয়ের বেশ মজা লাগলো এমনভাবে নদী পার হতে । ওপারে উঁহু ডাঙায় নদীতীরে প্রথম বসন্তে বিস্তর যে'টুকুল ফুটে আছে, বাতসে ভুর ভুর করচে আমের বউলের মিস্ট সুবাস, আকাবাঁকা শিমুলগাছে রাঙাফুল ফুটে আছে ।

অনঙ্গ ছেলেনের বললে—এখানে এই ছায়ায় বসে দুটো মর্দুড়ি খেয়ে নে—কখন ভাতছালা পেঁছবি তার ঠিক নেই ।

বড়ছেলেটা বললে—ওঃ, কি আমের বোল হয়েছে দ্যাখো সব গাছে । এবার বচ্চ আম হবে, না মা ?

—খেয়ে নে মর্দুড়ি । আমের বোল দেখবার সময় নেই এখন ।

ছেলে দু'টি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো নদীর পাড়ে গাছপালার ছায়ায় ফড়িং ধরবার জন্যে । অনঙ্গ ওদের বকেবকে আবার গাড়ীতে ওঠালে ।

নিষ্কণ্ড ফাল্গুন-দুপুরে মেঠোপথে আমবন, জাম, বট, বাঁশ, শিমুলগাছের ছায়ায় ছায়ায় গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে অনঙ্গ-বোয়ের কিম্বান ধরলো । বড়ছেলে বললে—মা, তুমি টুলে পড়ে যাচ্ যে, উঠে বোসো ।

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বললে—চোখে একটু জল লিলে হোত । ঘুম আসচে ।

ভাতছালা পেঁছতে বেলো পড়ে গেল । গাড়েবান বললে—ওব্দ সকালেসকালে এসে গ্যানামি মা-ঠাকুরোণ । ন'কোশ রাস্তা আমাদের গাঁ থে । গরুদুটোর সুধার বয়েস তাই আসতে পারলে ।

ভাতছালাতে অনঙ্গ-বোয়ের ঘর ছিল গ্রামের বাগান পাড়া থেকে অর্ধদুরে খুব বড় একটা বিলের কাছে । একখানা খড়ের ঘর, সঙ্গে ছোট একখানা রান্নাঘর, অনেকদিন কেউ না থাকতে চামার খড় কিছ, কিছ, উড়ে পড়েচে, মাটির দাওয়াতে ছাগল গরু উঠে খুঁড়ে ফেলেচে । উঠানের চারিদিকে কাঁশর বেড়া বেওনা ছিল, কাঁকে ফাঁকে রাংচিতার গাছ । বেড়ার শুকনো বাঁশ বেঁকে ভেঙে নিহরচে এখনো ।



মতি বাগদিনী ছুটে এল ওদের গরুর গাড়ী দেখে। মহাখুশির সঙ্গে বললে—বামুন-দিদি আলেন নাকি? ওমা, আমাদের কি ভাগ্য—

অনঙ্গ-বৌ বললে—আয় আয় ও মতি, ভাল আঁহস?

—নীড়ান, আগে একটু গড় করে নিই। পায়ের ধুলো দ্যান এটু—খোকারা বেশ বড় হয়েছে দেখাচি। বাঃ—

—ভাল ছিঁল?

—আপনাদের ছিঁচরণের আশীষ্বাদে। এখন আছেন কোথায়?

—ওই নতুনগাঁ, কাপালীপাড়ায়। ন'কৌশ রাস্তা এখন থেকে।

—এখানে এখন থাকবেন তো?

—বেশদিন কি থাকতে পারি? সেখানে উনি ইস্কুল খুলেছেন মস্তবড়। এক-ঘর ছাত্তর। দুদিন থাকবো তাই তাঁকে রেখে যেতে হবে।

—খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবো?

—আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে পঁটুলিতে। তুই দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে যা।

পদ্মবিলের থেকে কিছু দূরে মূচিপাড়া। প্রায় একশো ঘর মূচির বাস। পদ্মবিলে মাছ ধরে আশপাশের গ্রামে বেচে এরা জীবিকা-নির্বাহ করে। পোয়াটাক পথ দূরে গ্রামের অন্য অন্য জাত বাস করে। ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামেও নেই—এর একটা প্রধান কারণ, গঙ্গাচরণ এমন গ্রামে বাস করে নি যেখানে ব্রাহ্মণের বাস আছে। কারণ সে গ্রামে তার পসার থাকবে না। তার বদলে অন্য ব্রাহ্মণ যেখানে ডাকবার সন্নিবেহে আছে, এমন গ্রামে সে ঘর বাঁধতে যাবে কি জনো? তাতে আদর হয় না।

অনঙ্গ-বোয়ের আগমনের সংবাদে গোয়ালাপাড়া থেকে বৌ-ঝিরেরা দেখা করতে এল। কেউ নিয়ে এল একটি ঘটিতে সেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুর-গুড়ের পাটালি, কেউ একছড়া পাকা মর্তমান কলা। অনেক রাত পৰ্বন্ত ঝি-বোয়েরা দাওয়ায় বসে গল্প করলে। সকলেই মহাখুশি অনঙ্গ-বৌ আসাতে। সকলেই অনুরোধ জানালে এখানে কিছুদিন থাকতে। এখানে আবার উঠে এলে কেমন হয়? তারা সব সন্নিবেহে করে দেবে বসবাসের। কোনো অভাব-অভিযোগ থাকতে দেবে না। আসুন না বামুন-দিদি তাঁদের গারে আবার?

ওরা নিজেরাই ঘরদোর ঝটি দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। ঘাটির প্রদীপে তেল সলতে দিয়ে আলো জ্বললে দিলে।

মতি মূচিনী বললে—রাস্তরে আমি এসে শোবো ঘরের দাওয়ায়। দুটো খেয়ে আঁসি—

অনঙ্গ-বৌ তাকে বাড়ী গিয়ে যেতে দিলে না। যা রাস্তা হয়, এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নিলেই হবে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও তো থাকে।

সন্ধ্যার পরে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে জোর দক্ষিণ বাতাসে। বৌ-ঝিরেরা একে একে চলে গেল। মতি মূচিনী কলার পাত কেটে এনে বিলের ধারে ঘাসের উপর ভাত খেতে বসলো। গাড়োয়ান বললে তার শরীর খারাপ হয়েছে, সে কিছু খাবে না রাতে।

অনঙ্গ মাদুর পেতে গল্প করতে বসলো বিলের দিকের জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায়। শ্যামাচরণ ঘোষের বিধবা মেয়ে একটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে এসে হাজির হোল অনেক রাতে। সেও রাতে এখানে শোবে। অনঙ্গ-বৌকে সেও বড় ভালবাসে। এ মেয়েটির

বিবাহ হয়েছিল পাশের গ্রাম কুমুরে। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েচে, এখন প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর বয়স, দেখতে এখনও সুন্দরী, টকটকে ফর্সা রং, মৃৎস্রীও ভাল।

অনঙ্গ হেসে বললে—আয় কালী, চাঁদনি রাতে আবার একটা টোম কেন?

কালী আঁচল দিয়ে টোমটা বাঁচিয়ে আনচে পশ্চিমবিলের জোর দক্ষিণে হাওয়া থেকে। বললে—সে ওনো নয় নিদি, ওই মূঁচিপাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছমছম করে এত রাস্তারে।

—কেন রে? হুতে তোর ঘাড় মটকাবে?

কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাস্তার বেলা। তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—

—নূর পোড়ারমুখী, ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি রে?

—ভুতে বামুন-বোম্বম মানে না বৌদি, সত্যি কথা বলচি। সেবার হোল কি—

মতি মূঁচিনী ভয় পেয়ে বললে—বাদ দেও, ওসব গল্প এখন করে না। এই খেজুরের চটখানা পেতে শূরে পড় বামুন-দিদির পাশে।

অনঙ্গ-বোয়ের মনে আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে সে তার পুরোনো ঘরে ফিরে এসেচে। আবার পুরোনো সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পশ্চিমবিলের ওপর এমন জ্যোৎস্নারাত্রি কতকাল সে দেখে নি। অথচ এখানে এখন ছিল, তখন কোনদিন খাওয়া জুটতো, কোনদিন জুটতো না। এই মতি মূঁচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েচে, লোকের গাছের পাকা কাঁটাল চুরি করে পর্যন্ত এনে খাইয়েচে। এই কালী গোয়ালিনী বাড়ী থেকে ভাইবোকে লুকিয়ে নতুন ধানের চিঁড়ে এনে দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ বিলের জলের নিকে চেয়ে অনানন্দভাবে বললে—মনে আছে কালী, সেই একদিন লক্ষ্মীপুঞ্জোর রাতের কথা?

কালী মূদু হেসে চূপ করে রইল। বামুনের মেয়েকে খাবার যোগাড় করে দিয়েচে একদিন, তা কি সে এখন মূখে বলবে?

—মনে নেই?

—ও কথা ছেড়ে দাও বৌদিদি।

—তুই সেদিন চিঁড়ে না আনলে উপোস দিতে হোত।

—আবার ও কথা? ছিঃ—

অনঙ্গ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই পশ্চিমবিলের ওখানটাতে একটা শোল মাছ ধরেছিলাম, মনে আছে মতি?

মতি বললে—গামছা দিয়ে। ওমা, সেদিনের কথা যে! খুব মনে আছে। তুমি আর আমি নাইতি গিয়েছিলাম—

—মস্ত বড় মাছটা ছিল। না রে?

—ভাল কথা মনে হোল। কাল মনে করে দিয়েছি দিদিদি। দেওর মাছ ধরবে কাল, একটা বাণ মাছ কাল খাওয়াবো বামুদিদিদিদি। বম্বা সোয়াদ বিলির মাছের—

—সে যেন তুই আমায় নতুন শেখাচ্ছস মতি!

কালী বলে উঠলো—ওই শোনো মতির কথা! মূঁচি তা আর কত বৃদ্ধি হবে? বৌদিদি যেন আর এ গায়ের মানুষ না? দু'দিনের জন্য চলে গিয়েচে, তাই কি? আবার ফিরে আসবে না বৌদি?

—কেন আসবো না? আমার সাথ ছিল পশ্চিমবিলের একেবারে ধারে একখানা ঘর বাঁধবো।

—তোমার এ ঘরও ততো বিলের ধারে বোর্দি? কত দূর আর? ওই তো কাছেই।

—তা না রে, বিলের একেবারে ধারে ওই যে বাঁশঝাড়টা ওরই পাশে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে ছিল। বেশ ভালো হোত না?

—এখন বাঁধো। আমি বাঁশ, খড় সব ভ্রুটিয়ে দেবো বাবাকে বলে।

অনঙ্গ-বোয়ের ঘুম এল না অনেক রাত পর্যন্ত।

সে ভাবছিল তার জীবনের গত দিনগুলির কথা। ছুতোখালি গ্রামে তার বাপের বাড়ী। বাবা ছিলেন সামান্য অবস্থার গৃহস্থ, জমিজমার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন। হরিহরপুরে কি একটা কাজে গিয়ে গঙ্গাচরণের বাবার সঙ্গে আলাপ হয়—সেই সূত্রে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন গঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ তিনি মারা যান। মামানের চেষ্টায় ও গঙ্গাচরণের বাবার দয়ায় হরিহরপুরেই বিবাহ হয়। একখানা মাত্র লালপাড় শাড়ী ও মায়ের হাতের সোনাবাধানো শাখা—এর বেশ কিছু জ্বোটে নি অনঙ্গ-বোয়ের ভাগ্যে বিয়ের সময়ে।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণের বাবাও মারা গেলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞাতিরা নানারকম শত্রুতা করতে লাগলো। হরিহরপুরে একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ী ও একটা আমবাগান ছাড়া অন্য কিছু আয়কর সম্পত্তি ছিল না, জ্ঞাতদের শত্রুতায় অবস্থা শেষে এমন দাঁড়ালো যে আমবাগানের একটি আমও ঘরে আসে না। কোনো আয় ছিল না সংসারের, উঠানের মানকচু তুলে কানারগাঁতির হাটে নিজের মাথায় করে নিয়ে গিলে বিক্রি করে গঙ্গাচরণকে চাল কিনে আনতে হয়েছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেচে।

একদিন খুব বর্ষার দিন। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যাচে, অনঙ্গ-বো স্বামীকে বললে—হাংগা, বাড়ীঘর না সারালে এখানে তো আর থাকা যায় না?

গঙ্গাচরণ বললেন—কি করি বো, বসন্ত মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করি নি ভাবচো! আমি বসে নেই। দুশোটি টাকার এক পরসার কয়ে ও ছাদ উঠবে না।

—কোথায় পাবে দুশো টাকা? দুটাকার সম্বল আছে তোমার? আমার পরামর্শ শোনো, এ-দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাই।

—কোথায় যাই বলো দেশ ছেড়ে কে জায়গা দেবে?

—সে কথা আমি জানি? পূর্বসন্ধান—সে ভূমি বোঝো। আর জ্ঞাত-শত্রুদের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে টিকি থাকতে পারবে না ভূমি।

সেই হোল ওদের দেশত্যাগের সূত্রপাত। তারপর আশ্বিন মাসে পূজোর পরই ওরা প্রথমে এল এই ভাটছালা। এখানে প্রথম প্রথম ভালই চলছিল, পরে একটু অসুবিধে হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ, ভাটছালার এরা এসেছিল স্থানীয় গোয়ালারা ধানের জমি করে দেবে আশা দিয়েছিল বলে। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, ধানের জমির কোনো বন্দোবস্তই আর হয়ে উঠলো না। এক বেলা খাওয়া হয় ওদের ভো অনা বেলা হয় না। সেই সময় এই কালী গোয়ালিনী যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠে যায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ-বো মরে

যাওয়ার যোগাড় হোল। তখন নতুন গায়ের কাপালীদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের হাটেই আলাপ হয় গঙ্গাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাপ্টার চাইতে শুলে গঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গায়ে বাস।

অনঙ্গ বলে—বালী ঘুমুলে নাকি? বাবাঃ কি ঘুম তোদের?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বলে—বামুন-দাদি, ঘুমোও নি এখনো? রাত যে পুইরে এল! ঘুমিয়ে পড়ো। পুবে ফর্সা হোল—

—তোর মনু হোল পোড়ারমুখী—

অনঙ্গ-বো ভাবছিল তার জীবনে কত জায়গায় যাওয়া হোল, কত কি দেখা হোল! তার কলসী কটা মেয়ে এমন নানা জায়গায় বেড়িয়েচে? ওই তো তারই সম্বরসী হেম রয়েছে হরিহরপুরে, তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে। কোথাও যায় নি, কোনো দেশ দেখে নি।

সে ভাবলে—ভালো কাপড় পরতে পারি নি, খেতে পাই নি তাই কি? আমার মত এত জায়গা বেড়িয়েচে হেম? কত জায়গা। ধর হরিহরপুর, সেখান থেকে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর—তার পর এখন নতুনগা। উঃ—কথাটা কালীকে বলবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ডাক দিলে—ও কালী, কালী, একটা কথা শোন না?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বললে—বামুন-দাদি, তুমি জ্ঞানালে দেখিচি, ঘুমুত দেবা না রাস্তরে? কালী ঘুমিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ, ওকে আর ডাকাজাকি করো না। রাত পুইরে গেল যে।

অনঙ্গ-বো হেসে তার গায়ে একটা কাটি ছুঁড়ে মেরে বললে—দুই পোড়ারমুখী—

যে দু'দিন অনঙ্গ এখানে রইল, এমন নিছক আনন্দের দু'টি দিন ওর জীবনে কতকাল আসে নি। চলে আসবার দিন মতি মূর্চিনী কেঁদে আকুল হোল। সে এ গায়ে আর থাকতে চায় না, অনঙ্গ-বোয়ের সঙ্গে চলে যাবে। কালী গোয়ালিনী আধ সের ভাল গাওয়া ঘি ও দুটো মানকচু নিয়ে এসে দিলে। মতি খেজুর গুড়ের পাটাল নিয়ে এলো খেজুর গাছের বাকলায় বেঁধে।

গঙ্গাচরণ জিনিসপত্র দেখে বললে—বাঃ অনেক সওদা করে এনেছ দেখিচি—

অনঙ্গ হাসি হাসি মুখে বললে—দাম দিতে হবে আমাকে কিস্তু।

—ভাল কথাই তো। কেমন দেখলে?

—অতি চমৎকার। আমার যে কি ভাল লেগেছে! মতি এল, কালী এল, গায়ের কত কি-বো দেখতে এল—

—ওরা এখনো ভোলে নি আমাদের?

—ভুলে যাবে? সবাই বলে এখানে এসে আবার বাস করুন বামুন-দাদি। হ্যাঁগা, পশ্চিমবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধো না কেন? আমার বড় সাধ কিস্তু।

—আবার ভাতছালা ফিরে যাবে? সে হয় না। পাঠশালা তমে উঠেছে। এখন কি নড়া যায়, গেলেই লোকসান।

—তুমি যা ভালো বোঝো। আমার কি-তু বাপু ওখানে একখানা ঘর বাঁধবার বড় ইচ্ছে।

গঙ্গাচরণ সেদিন পাঠশালা জমিয়ে বসেচে, সামনের পথ দিয়ে একজন পথ-চলতি লোক যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাঠশালার মধ্যে ঢুকে বললে—এটা পাঠশালা ?

—হ্যাঁ।

—নশাই দেখিচি ব্রাহ্মণ, একটু তামাক খাওয়াতে পারেন ? আমিও ব্রাহ্মণ। নমস্কার।

—বসুন বসুন, নমস্কার—ওরে—

গঙ্গাচরণের ইশিগতে একজন ছাত্র তামাক সাজতে ছুটলো।

আগন্তুক লোকটির পায়ে পুরোনো ও তালি দেওয়া কার্শ্বসের জুতো, গায়ে মলিন পিরান, হাতে একগাছি তৈলপক্ক সরু বণের ছড়ি। পায়ে জুতো থাকা সবেও সাদা ধুলো হাঁটু পর্যন্ত উঠেচে। মোকটি একটা কেরোসিন কাঠের বাস্তের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লো।

গঙ্গাচরণ বললে—নশায়ের নাম ?

—আজ্ঞে দুর্গা বাড়ুযো। নিবাস, কুমুরে নাগরখালি, আড়ংঘাটার সন্নিকট। আমিও আপনার মত ইন্সকুল মাস্টার।—অর্শ্বকপূরে চেনেন ? এখান থেকে পাঁচ কোশ পথ। অর্শ্বকপূরে লোয়ার প্রাইমারী ইন্সকুলে সেকেন্ড পিণ্ডিত।

—বেশ, বেশ। তামাক ইচ্ছে কবুন—

—আগে আমার একটু জল খাওয়াতে পারেন ?

—ডাব খাবেন ? ওরে পাঁচু, ষাও বাবা, হাঁর কাপালীর চারাগাছ থেকে আমার নাম করে দুটো ডাব চট করে পেড়ে নিয়ে এসো তো ?

আগন্তুক লোকটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাঃ, আপনার দেখিচি এখানে বেশ পসার।

গঙ্গাচরণ মৃদু হেসে চূপ করে রইল। বৃন্দমান ব্যক্তি নিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা নিজের মধ্যে বলে না।

ইতিমধ্যে ডাব এসে পড়লো। ডাবের জল খেয়ে দুর্গাপদ বাড়ুযো আরামে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁকো হাতে নিয়ে সজোরে ধূমপান করতে লাগলো। আপন মনেই বললে—বেশ আছেন অর্পণ—বেশ আছেন—

গঙ্গাচরণ বিনীতভাবে বললে—আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে—

—না, না, বেশ আছেন। দেখে আনন্দ হয়, আমার মতই ইন্সকুল মাস্টার একজন, ভাল ভাবে থাকতে দেখলেই আনন্দ হয়।

—অর্পণ ওখানে কি রকম পান ?

—মাইনে পাই তিন টাকা। ইন্সকুল থেকে। গভর্ণমেন্টের এত পাই দেড় টাকা। ইউনিয়ন বোর্ডের এত পাই ন'সিকে মাসে। এই ধরুন সবসাকুলো পৌনে সাত টাকা। তা এক রকম চলে যায়—

গঙ্গাচরণ বললে—মাসে মাসে পান তো ?

দুর্গাপদ বাড়ুযো গর্বের সুরে বললে—নিশ্চয়ই, এ হোল গভর্ণমেন্টের কারবার। এতে কোনো গোপনাল হবার জোটি নেই। তবে মোটে সাত টাকায় সংসার ভাল চলে না।

—নশায়ের ছেলেরপলে কি ?

—একটি মাত্র মেয়ে, আর আমার পরিবার। তবে আমার বিধবা ভগ্নী আমার সংসারেরই থাকে। সাত টাকায় এতগুলি লোকের—

—আর কিছুর আয় নেই ?

—আম্বে না । আমি বিদেশী লোক, ওখানে আর কি আয় থাকবে ?

—ও গ্রামে কি ব্রাহ্মণের বাস বেশি ? নাকি অন্য অন্য জাতও আছে ? আপনি সঙ্গে সঙ্গে দশকর্ম ধরুন না কেন ? এই ধরুন লক্ষ্মীপুত্রো মনসাপুত্রো, ষষ্ঠীপুত্রোহুত্রো—

—ও-সব চলবে না । সেখানে পুরাত আছে গ্রামে । ব্রাহ্মণের গ্রাম—

—ওখানেই আপনি ভুল করেছেন—এই ! গোলমাল করবি তো একেবারে পিঠের ছাল ভুলবো সব । ব্রাহ্মণের গ্রামে বসতে নেই কখনো । ওতে পসার হয় না মশাই—

—কথাটা ঠিকই বলেছেন । আপনি বেশ আছেন, ডাব আনতে বললেন অর্মান ডাব এসে হাজির । অর্মান না হোলে বাসের সুখ । আমার আর কোনো আয় নেই ওই পৌনে সাত টাকা ছাড়া । তবে ধরুন কলাটা, বেগুনটা মধ্যে মধ্যে ছাত্রের আনে ।

দুর্গাপদ বাঁড়ুয়্যে কথাবাতীর ফাঁকে অনামনস্ক হয়ে কি ডাবতে লাগলো । পুনরায় তামাক সেজে যখন হুকো তার হাতে পেওয়া হোল, তখন বললে—একটা কথা ভাবিচি—

—কি বলুন ?

—দু'জনে মিলে একটা আপার প্রাইমারি ইন্স্কুল গড়ে তুলি না কেন ? আপনি কি গুরুট্রোনিং পাস ?

—না ।

দুর্গাপদ চিন্তাকুল ভাবে বললে—তাই তো । গুরুট্রোনিং পাস না থাকলে হেড মাস্টার হতে পারবেন না যে ! বাইরে থেকে আবার কাউকে আনলে তাকে ভাগ দিতে হবে কিনা ? সে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নেবে । তেতে দু'বিধে হবে না—আমার ওখানে আর ভাল লাগচে না । সঙ্গী নেই, দুটো কথা কইবার মানুষ নেই—ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশিক্ষিত, চাষবাসই নিয়ে আছে । সংসার আনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধম্মকথা, একটু সং আলোচনা বড় পছন্দ করি ।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—এই রে, খেয়েছে ! মূখে বললে—সে তো খুব ভালো কথা ।

—আপনি আর আমি সম্ভাবসায়ী । তাই আপনার কাছে এত কথা খুলে বললাম । কিছুর মনে করবেন না যেন ! আচ্ছা আজ উঠি । অনেকদূর যেতে হবে ।

—আবার যখন এদিকে আসবেন, দেখা দেবেন দয়া করে ।

—সে আর বলতে মশাই ? একদিন আমার পরিবারকে নিয়ে এসে আপনাদের বাড়ীতে আলাপ করিয়ে দেবো । আচ্ছা আসি, নমস্কার—

গ্রামের বিশ্বাস মশায়ের নার্তিটি কাকতালীয় ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলো গঙ্গাচরণের শাস্তি-স্বস্ত্যায়নের পরে । এতে গঙ্গাচরণের পসার আরো বেড়ে গেল গ্রামের লোকের কাছে । একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়ে একবার যেতে হচ্ছে পান্ডিত মশায়—

—এসো, বসো । কোথায় বাড়ী ?

—কামদেবপুর, এখান থেকে তিন ক্রোশ । আপনার নাম শুনে আসচি । সবাই বললে, পান্ডিত মশায় গুণী লোক । আমাদের গাঁয়ের আশেপাশে বড় ওলাউঠার ব্যারাম চলচে । আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে ।

গঙ্গাচরণ 'গা বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো। তবুও আন্দাজ করে নিল লোকটা কি চাইছে। তাদের গ্রামে যাতে ওলাউটার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামের চারিদিক গাণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতে হবে, এই ব্যাপার।

কাঁচা লোকের মতো গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখনি করে দেবো, তাতে আর কি' ইত্যাদি। সে গম্ভীর ভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্‌গমসুরে বললে—ঠাকুর মশায়, হবে তো আমাদের ওপর দয়া?

গঙ্গাচরণ স্থির ভাবে বললে—তাই ভাবচি।

—কেন পণ্ডিতমশায়? এ আপনাকে হাতে নিতেই হবে—

—বহু শক্ত কাজ। বহু শক্ত—

কিছুক্ষণ দৃষ্টিতেই চূপ। পরে লোকটা পুনরায় আকুল ভাবে বললে—তবে কি হবে না? গঙ্গাচরণ নীরব। দৃষ্টিমিট।

—পণ্ডিত মশায়?

—বাপু হে, অমন বকবক কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলে যে বকে। দাঁড়াও, ভাবতে পাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চূপ করে রইল, যদিও সে বুদ্ধিতে পারল না এতক্ষণ সে অমন কি বকাঁছিল, যাতে পণ্ডিত মশায়ের মাথা ধরতে পারে। নিজে থেকে সে কোনো কথা বলতে আর সাহস করলে না। গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পর বললে—কুলকুর্ডালনী জাগরণ করতে হবে, বহু শক্ত কথা। পরস্য খরচ করতে হবে। পারবে?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে—আর্পণ যা বলেন পণ্ডিতমশাই। আমাদের গায়ে আমরা ঘাট-সন্দের ঘর বাস করি। হি'দু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো। প্রাণ নিয়ে কথা, আশপাশের গা মরে উজোড় হয়ে যাচ্ছে, যদি পরস্য খরচ করি আমাদের প্রাণগুলো বাঁচে—

—নদীর জল খাও?

—আস্তে হ্যাঁ, আমাদের গায়ের নিচেই বাঁওড়—বাঁওড়ের জল খাই।

—গা বন্ধ করলে বাঁওড়ের জল আর খেতে পাবে না কেউ। পাতকুয়োর জল খেতে হবে।

—সে আপনি যেমন আস্তে করবেন—কত খরচ হবে বলুন।

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে—ফর্দ করে দিচ্ছি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকার পর মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করে নি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশা সীমা পেঁছে গিয়েচে, ভা; ওছালাতেও থাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনে রাতে একবার মাত্র অনাহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে?

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। সংসারের কি কি দরকার? অনঙ্গ-বৈ; বৈশ আদায় করতে জানে না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ খাড়া করলে, তেমন ব্যয়সাধা ফর্দ নয়।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুমি গা বন্ধ করতে পারবে তো? এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আমি পাঠশালায় ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবিশিকা' বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গা বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গা বন্ধ করতে হবে না।

বাইরে এসে বললে—ফর্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের—কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তুরপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধূতিচাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্বকুড়।

লোকটা ফর্দ নিয়ে চলে গেল।

কামদেবপুর গ্রামে যোদিন গঙ্গাচরণ যার, সেদিনই সেখানে একজন বললে—পশ্চিম মশাই, চাল বন্ড আড়া হবে, কিছু চাল এ সময়ে কিনে রাখলে ভাল হয়।

—কত আড়া হবে?

—তা ধরুন মনে দু টোকা চড়া আর্চিয়া নয়।

কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করলে না। শাস্তিস্বস্তায়ন এবং গা বন্ধ করার প্রক্রিয়া দেখবার জন্য আশপাশ থেকে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। গ্রামের চাষীরা বললে—মনে দু টোকা! তা'হলি আর ভাবনা ছেল না। কে বললে এ সব কথা?

আগেকার বস্তা নিতান্ত বাজে লোক নয়—ধান চালের চালানি কাজ করেছে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়। সে জোর গলায় বললে—ডোমরা কিছু বোঝো না হে—আমার মনে হচ্ছে গতক দেখে, চালের দর ঠিক বাড়বে। আমি এ কারবার অনেকদিন ধরে করে আসছি, আমি বুঝতে পারি।

কথাটা কেউ গায়ে মাখলে না। তখন গা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়ে সকলে গঙ্গাচরণকে নাহায্য করতে ব্যস্ত। হোম শেষ করে পূজা আরম্ভ করতে গঙ্গাচরণ পুরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। এসব অঙ্গ পাড়াগা, এখানকার হাল-চাল ভালই জানা আছে তার। পরস্যা কি অর্মান অর্মান রোজগার হয়? তিনটি মাটির কলসী সিঁদুর দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়েছে, তালপাতার তাঁর বানিয়ে চারকোণে পঁতে পৈতের সূতো দিয়ে সেগুলো পরস্পর বাঁধতে হয়েছে, গাবকাঠের পদতুল তৈরি করতে হয়েছে গ্রাম্য ছুঁতোর দিয়ে, তেল সিঁদুর লেপে সেটাকে তেমাথা রাস্তায় পঁতেতে হয়েছে—হাসানা কি কম? সে যত বিদঘুটে ফরমাস করে, গ্রামের লোকের ভত শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তার ওপরে।

ওর কানে গেল লোক বসাবলি করছে—বলি, এ কি তুই যা তা পেলি রে? ও'র পেটে এ'লম কত? যাকে বলে পশ্চিম। এ কি তুই বাগান গরি দীন, ভুট্টাচাষ পেয়েছিস?

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—নিষ্কালি সরা দু খানা আর শেষত আকস্মের ভাল দুটো—

ঠিক দুপুরবেলা, এখন এ সব জিনিস কোথা থেকে যোগাড় হ'ল, আর কেই বা আসে। সবাই মূখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

একজন বিনীত ভাবে বললে—আজ্ঞে, এ গায়ে তো কুমোর নেই, নিষ্কালি সরা এখন কোথায় পাই?

গঙ্গাচরণ রাগের সুরে বললে—তবে থাকলো পড়ে, ফাঁকি-জুঁকির কাজ আমার দিয়ে হবে



না। গাঁ বন্ধ করতে নিশ্চালি সরি লাগে এ কথা কে না জানে ? আগে থেকে যোগাড় ক'রে রেখে দিতে পারো নি ?

গ্রামের লোকে নিজেদের অস্ত্রস্বয় নিজেসাই লিঙ্গত হয়ে উঠলো। বলাবলি করলে—এ খাঁটি লোক বাবা। এর কাছে কোন কাজের ফাঁকি নেই। যেভাবে হোক সরি এনে নিতেই হবে।

নানা অপরিচিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বেলা দুটোর সময়ে প্রক্রিয়া শেষ হোল।

গঙ্গাচরণ বললে—সবাই এসে শান্তিঙ্গল নিয়ে যাও—

খুব ঘটা ক'রে শান্তিঙ্গল ছিটিয়ে দিয়ে গঙ্গাচরণ গম্ভীর মুখে বললে—এবার আসল কাজটি বাকি—

উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চায়। সকাল থেকে ফাইফরমাসের চোটে প্রত্যেকে হিমসিম খেয়ে গিয়েছে, শান্তিঙ্গল পর্যন্ত ছিটানো হয়ে গেল, তবুও এখনও আসল কাজটি হোল না ! বেলা তিনটে বাজে এদিকে।

গ্রামের মাতাম্বর লোক এক-আধজন এগিয়ে বললে—আজ্ঞে, কি কাজের কথা বলছেন পণ্ডিত মহাই ?

—ঈশান কোণে নিমগাছ আছে এ গায়ে ?

—আজ্ঞে কোথায় বললেন ?

—ঈশান কোণে।

তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে—সে কোথায় ?

—ঈশান কোণে জানো না ? উত্তর-পশ্চিম কোণ—এই দিক—

আঙুল দিয়ে গঙ্গাচরণ ঈশান কোণ দেখিয়ে দেয়। গ্রামে দুকবার পথই সৈদিক দিয়ে, আসবার সময় সৈদিকে একটা বড় নিমগাছ সে লক্ষ্য করে এসেছে অজই সকালবেলা।

একজন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে একটা।

—আছে ? থাকতেই হবে। ঈশানে যোগিনী যে—

—আজ্ঞে, কি করতে হবে ?

—ওখানে ধনুজা বাধতে হবে। চলো আমার সঙ্গে—

দুজন জোয়ান ছোকরা গঙ্গাচরণের আদেশে নিমগাছের মগডালে ধনুজা বাধতে উঠলো। বেলা চারটে বাজে।

গঙ্গাচরণ হাঁপ ফেলে নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বললে—যাক, এবার ব্যাপারটা মিটে গেল। বাবাঃ, পয়সা খরচ ক'রে ত্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করলে তোমরা, এর মধ্যে খাঁত থাকতে দেবো কেন ? এবার তোমরাও নিশ্চিন্দ, আমিও নিশ্চিন্দ। গাঁ বন্ধ বললেই গাঁ বন্ধ হয় ! খার্টুন আছে।

সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে আপ্ত হয়ে উঠলো। এমন না হলে পণ্ডিত ?

গ্রামের সবাই মিলে অনুরোধ করে এক গোয়ালি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাচরণের জলযোগের ব্যবস্থা করলে। গঙ্গাচরণ বললে—ডাবের জল ছাড়া আমি অন্য জল খাবো না। তোমরাও নদীর জল ব্যবহার বন্ধ কর একেবারে। এক মাসকাল নদীর জল কেউ খেতে পারে না। বাসি বা পচা জ্বিনিস খাবে না। মাছি বসলে সে খাবার তখনি ফেলে দেবে। মনে থাকবে ? সবাইকে বলে দাও—

মাতঙ্গর লোকেরা সকলকে কথাটা বলে বদ্বিয়ে দিলে ।

সন্ধ্যার আগে গরুর গাড়ী করে ফিরচে, পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য এসে বললে—  
নমস্কার, চললেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

—আমার একটা কথা আছে, গাড়ী থেকে নেমে একটু শুনুন—

গঙ্গাচরণ গাড়ী থেকে নেমে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে দীনু ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বললে ।  
দীনু ওর হাত ধরে বললে—আমার একটা অনুরোধ—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন—

—আমায় কিছুঁ দিয়ে যান আজ যা পেলেন—

—কেন ?

—আমি না খেয়ে মরছি । ঘরে এক দানা চাল নেই । চালের দাম হুঁ হুঁ করে বাড়ছে ।  
ছিল সাড়ে চার, হোল ছ'টাকা । পাঁচ-ছটি পুঁষা নিয়ে এখন চালাই কি করে বলুন ?  
আমি নিজের এই বড়ো বয়সে রাজস্ব না করলে সংসার চলে না । অথচ বড়ো হয়ে পড়োঁচ  
বলে এখন আর কেউ ডাকেও না, চোকি আর তেমন ভাল দেখা নে ।

গঙ্গাচরণ চুপ করে থেকে বললে—তাই তো—বড় মর্শকিল দেখছি । আপনার কয়স কত ?

—উনসত্তর যাচ্ছে । মেয়েরা বড় ছেলে বড় হোলে ভাল ছিল । এ বড়ো বয়সে রাজস্ব  
করার কেউ নেই আমি ছাড়া ।

—চালের দাম কত চড়েচে ?

—আরও নাকি চড়ে শুনচি । এখনই খেতে পাচ্ছি নে—আরও বাড়লে কি কিনি খেতে  
পারবো ! এই যুদ্ধের দরুন নাকি এমনটা হচ্ছে—

গঙ্গাচরণ মাঝে-মিথালে শোনে বটে যুদ্ধের কথা । মাঝে মাঝে দু-একখানা এরোপ্লেন  
মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেচে । তবে এ অজ্ঞ চাষাণ্ডয়ে কেউ খবরের কাগজ  
নেয় না, শহরও সাত-আট মাইল দূরে । গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় বাস্ত থাকে । ওসব চর্চা  
করবার সময়ও তার নেই । তবু কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললে । সে বড়ো ভট্টাচার্যকে  
বললে—যা চাল পেয়েছি, তা থেকে কিছুঁ আপনি নিয়ে যান—আর কিছুঁ ভাল আর  
গাওয়া ঘি—

দীনু ভট্টাচার্য বললে—না, গাওয়া ঘি আমার দরকার নেই । বলে ভাত জোটে না,  
গাওয়া ঘি ! আচ্ছা, আমি এই কাপড়ের মূড়ে-তই চাল ভাল বেঁধে নিই । আপনি আমায়  
বাঁচালেন । ভগবান আপনার ভাল করুন ।

কথাটা ভাবতে ভাবতে গঙ্গাচরণ বাড়ী এসে পৌঁছুল । অনঙ্গ-বৌ জিনিসপত্র দেখে খুব  
খুঁশ । বললে—চাল এত কম কেন ?

—এক বড়ো বাবুন ভট্টাচার্যকে কিছুঁ দিয়ে এসেছি পথে ।

—যাক গে, ভালই করেচ । দিলে ভাত কল না, বরং বেড়ে যায় ।

—শুনচি নাকি চালের দাম বাড়বে, সবাই বলচে ।

—ছ'টাকা থেকে আরও বাড়বে ! বল কি গো ?

—সবই তো বলচে । যুদ্ধের দরুন নাকি এমন হচ্ছে—

—কর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেচে গো ?

—সে সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের রাজ্যের সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের—  
সব জিনিস নাকি আক্কা হয়ে উঠবে।

—হোক গে, আমাদের তো অধিক জিনিস কিনে খেতে হয় না। তবে চালটা যদি  
খেড়ে যায়—

—সেই কথাই তো ভাবচি—

দেদিন বিকেলে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী বসে এই সব কথার আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্বাস  
মশায় বললেন—আমাদের ভাবনা কি? ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবে  
এর পরে।

বুধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হ্যাক্সামা কতদিনে মিটেবে ঠাকুর মশাই? শুনচি  
নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েছে?

বিশ্বাস মশায় বললে—সিন্ধাপুর—

নবদ্বীপ বললে—সে কোন জেলা? আমাদের এই যশোর, না খুলনে? মামদপুরের  
কাছে?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না। সে হোল সমুদ্রের ধারে।  
বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই?

গঙ্গাচরণ ভাল জানে না, কিন্তু এদের সমানে অজ্ঞতাটা দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং  
সে বললে—হ্যাঁ। একটু দূরে—পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

নবদ্বীপ বললে—পুরীর কাছে? আমার মা একবার পুরী গিয়েছিলেন। পুরী,  
সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর। সে বুধ মেদিনীপুর জেলা?

বিশ্বাস মশায় বললেন—হ্যাঁ।

ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হলে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বসে পরদিন ছেলের জিজ্ঞেস করলে—এই সিন্ধাপুর কোথায়  
জিনিস?

কেউ বলতে পারলে না, কেউ নামই শোনে নি।

গঙ্গাচরণ নিজের ছেলের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললে—হাবু, সিন্ধাপুর  
কোথায়?

হাবু দাঁড়িয়ে উঠে সগর্বে বললে—পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলায়।

পাঠশালার অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে হাবুর দিকে চেয়ে রইল।

বেশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করলে গঙ্গাচরণ বাজারের  
জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে। প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশঃ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা যাক গে,  
দেদিন হাটে একটা ঘটনা দেখে শব্দ গঙ্গাচরণ নয়, হাটের সব লোকই অবাক হয়ে গেল।

ঘটনাটা অতি সামান্য। ইয়াদিন বিশ্বাসের বড় গোলাদারি দোকান। তাতে কেরোসিন  
তেল আনতে গিয়ে অনেকে শব্দ হাতে ফিরে গেল। তেল নাকি নেই?

গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না কথাটা। সে নিজের তেল নেবে। তেলের বোতল হাতে  
দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়াদিনের দাদা ইয়াকুব বললে—তেল নেই পণ্ডিত মশাই—

—নেই ?

—আজ্ঞে না ।

—তেল আনো নি ?

—আজ্ঞে পাওয়া যাচ্ছে না ।

—সে কি কথা ? ক্রিসিন পাওয়া যাচ্ছে না ?

—আমাদের চালান আসে নি এবার একসম । শুনলাম নাকি মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতে হবে চালান পাঠাবার আগে ।

—কবে আসতে পারে ?

—আজ্ঞে কিছ্‌র ঠিক নেই—

গঙ্গাচরণ বোতল হাতে বোরিয়ে আসছে, ইয়াকুব দূর নিচু করে বললে—বাবু, এই বেলা কিছ্‌র নুন আর কিছ্‌র চাল কিনে রাখুন—ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তা হলে কন্‌স্ট্রেন্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে !

—কেন ও দুটো জিনিসও কি পাওয়া যাবে না নাকি ?

—পাঁশ্‌ডত মশাই, সাবধানের মার নেই, আমরা হোলাম ব্যবসাদার মানুস, সব দিকে নজর রেখে চলতি হয় কিনা ? কে জানে কি হয় মশাই ।

গঙ্গাচরণ ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে এসে শ্রীকে বললে—আজ একটি আশ্চ'র্য' কান্ড দেখলাম—

—কি গা ?

—পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম । কোনো দোকানেই নেই—আরও একটি কথা বললে দোকানদার । চালও কিনে রাখতে হবে নাকি ।

অনঙ্গ-বৌ তাঁচ্ছলোর সঙ্গে বললে—দূর ! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুঁর কথা । চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দু'নিয়া পুঁথিয়ে লোকে বাঁচতে পারে কঙ্‌খনো ? কি হবে এখন ?

—যা দেবে !

অনঙ্গ টাটকা-ভাজা মূড়ি গাওয়া ঘিতে মেখে নিয়ে এসে দিলে—তার সঙ্গে শসা কুচোনো । বললে—একটু চিনি দেবো, ওর সঙ্গে মেখে খাবে ?

—নাঃ, চিনি আমার ভাল লাগে না । হাবু কোথায় ?

—বাড়ী নেই । বিশ্বেস মশায়ের নাতির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে কিনা । ডেকে নিয়ে গেল এসে । বড় মানুসের নাতির সঙ্গে ভাব থাকা ভালো । সময়ে অসময়ে দুটো জিনিস চাইলেও পাওয়া যাবে । সেজন্যে আমিও যেতে বারণ করি নি ।

—এসো দুটো মূড়ি খাও আমার সঙ্গে ।

অনঙ্গ-বৌ সলঞ্জ হেসে বললে—আহা, রস যে উথলে উঠছে । আজ বাবে কাল যে ছেলের বেঁ' ঘরে আনতে হবে খেয়াল আছে ?

বলেই এসে স্বামীর পাশে বসে বাঁটি থেকে একমুঠো ঘি-মাখা মূড়ি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল । স্বামীর দিকে বিনোদন কটাক্ষে চেয়ে বললে—মনে পড়ে সেই ভাতছালার বিলের ধারে একদিন তুমি আর আমি এক বাঁটি থেকে চি'ড়ের ফনার খেয়েছিলাম ? হাবু তখন ছোট ।

অনঙ্গ-বোয়ের হাসি ও চোখের বিলোল দৃষ্টি প্রমাণ করিয়ে দিলে সে বিগতযৌবনা নয়, পুরুষের মন এখনও হরণ করার শক্তি সে হারায় নি।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল মূগ্ধ দৃষ্টিতে।

ফাল্গুন মাসের শেষে গঙ্গাচরণ একদিন পাঠশালার ছুটি দিয়ে চলে আসছে, কামদেবপুরের দুর্গা পূজিত পথে ওকে ধরে বললে—ভাল আছেন? সোঁদিন গিয়েছিলেন কামদেবপুর, গ্রামি ছিলাম না, নমস্কার।

—নমস্কার। ভাল আছেন?

—একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসা।

—কেন বলুন?

—আমার তো আর ওখানে চলে না। পৌনে সাত টাকা মাইনেতে একেবারে অচল হোল। চালের মণ হয়েছে দশ টাকা।

গঙ্গাচরণের বুকটার মধ্যে ধক করে উঠলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুর্গা পূজিতের দিকে চেয়ে সে বললে—কোথায় শুনলেন?

—আপনি জেনে আসুন রাধিকাপুরের বাজারে।

—সোঁদিন ছিল চার টাকা, হোল ছ'টাকা, এখন অশনি দশ টাকা!

—মিথো কথা বলি নি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।

—মগে চার টাকা চড়ে গেল! বলেন কি?

—তার চেয়েও একাট কথা শোনলাম, তা আরও ভয়ানক। চাল নারিক এবার না কিনলে এরপরে বাজারে আর মিলবে না। শুনুন তো পেটের মধ্যে হাত পা ঢুকে গেল মশাই।

গঙ্গাচরণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পূজিত ওর বাড়ী পর্যন্ত এল। গঙ্গাচরণের বাইরেরা ঘর নেই, উঠানের ঘাসের ওপরে মাদুর পেতে দুর্গা পূজিতের কসবার জায়গা করে দিলে। তামাক সেজে হাতে দিলে। বললে—ডর কেটে দেবো? খাবেন?

—হ্যাঁ, সে তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশ আছেন।

—আর কিছ্ খাবেন?

—না, না, থাক। বসুন আপনি।

একথা ওকথা হয়, দুর্গা পূজিত কিস্তু ওঠবার নাম করে না।

গঙ্গাচরণ ভাবলে, কামদেবপুর এতটা পথ—যাবে কি করে? সম্ভব তো হয়ে গেল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। গঙ্গাচরণ কিছু বুদ্ধিতে পারছে না।

এখনও যায় না কেন? শীতের বেলা, কোন কালে সূর্য অস্ত্রে গিয়েচে।

হঠাৎ দুর্গা পূজিত বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা—এবেলা আমি দুটো খাবো কিস্তু এখানে।

—খাবেন? তাহলে বাড়ীর মধ্যে বলে আসি।

অনঙ্গ-বোঁ রান্নাঘরে চাল ভাজাছিল, স্বামীকে দেখে বললে—ওগো, তোমার সেই পূজিত মশায়ের জন্যে দুটো চাল ভাজাচি যে! তেল নুন মেখে তোমরা দুজনই খাওগে—

—শোনো, পূজিত মশাই রাস্তিরে এখানে খাবেন।

—তুমি বললে বুদ্ধি?

—না উনিই বলছেন। আমি কিছ্ বলি নি।

—তানা কিছ, নয়, কি দিয়ে ভাত দিই পাতে? একটু দুধ বা ছিঁল ওবেলা তুমি আর হাবু খেয়েচ।

দুর্গা পিঁড়তের কথাবার্তা শুনে গঙ্গাচরণের মনে হোল সে খুব ভয় পেয়েছে। এমন একটা অবস্থা আসবে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। ওর ভয়ের ছেঁকোচ এসে গঙ্গাচরণের মনেও পেঁছায়। বাইরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় অশ্বকার রাত্রি বসবার জন্য হাবু একটা বাঁশের মাচা করেছিল। দুই পিঁড়তে সেই মাচার ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দাঁবা ফুরফুরে ফাগুনে হাওয়ার বসে তামাক ধরিয়ে কথাবার্তা বলছিল। হাবু এসে বললে—বাবা, নিয়ে এসো ওঁকে, খাওয়ার জায়গা হয়েছে—

মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা ও বড়াভাজা। অনঙ্গ-বো রিধিতে পারে খুব ভাল। দুর্গা পিঁড়তের মনে হোল এমন সুস্বাদু অন্নবাজন অনেক দিন খায় নি। হাবু বললে—না ক্লিস্কেস করচে আপনাকে কি আর দুখানা বড়াভাজা পাবে?

গঙ্গাচরণও ওই সঙ্গে খেতে বসেচে। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয় না। ক্লিস্কেস করাকরি কি?

অনঙ্গ-বো দ্রাড়াতে থেকে হাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলে একটা স্কেবিতে কিছ পেঁপের ডালনা, ক'খানা বড়াভাজা।

গঙ্গাচরণ বললে—ওগো, তুমি ওঁর সামনে বেরোও, উঁনি তোমার ধনপতি কাকার কয়েসী। আপনার বরেন্দ আমার চেয়ে বেশি হবে, কি বলেন?

দুর্গা পিঁড়ত বললে—অনেক বেশি। বোঁমাকে আসতে বলুন না? একটা কাঁচা ঝাল নিয়ে আসুন।

একটু পরে অনঙ্গ-বো লম্বা-কুণ্ডা-জড়িত সূঁচের কঁচের চূড়ি-পরা হাতে গোটা-দুই কাঁচা লম্বা এনে দুর্গা পিঁড়তের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পিঁড়ত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে—মা যে আমার লম্বা পিঁড়তের। আমার এক ভাইঝির কয়েসী বটে। কোনো লম্বা নেই আমার সামনে বোঁমা—একটু সরবের তেল আছে। দাও তো মা—

হাবু বললে—মা বলচে, দুধ নেই। একটু তেঁতুল গড়ু মেখে ভাত কটা খাবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব। দুধ কোথায় পাবো? বাড়ীতেই কি রোজ দুধ খাই নাকি?

দুর্গা পিঁড়ত এই বয়সেও কিন্তু বেশ খেতে পারে। মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত শূঁধু তেঁতুল গড়ু মেখেই যা খেলে, গঙ্গাচরণের তা দু'বেলার আহাৰ। অনঙ্গ-বো কিন্তু খুব বর্দাশ হোল দুর্গা পিঁড়তের খাওয়া দেখে। যে মাদুর খেতে পারে, তাকে নাকি খাইয়ে সুখ। নিজের তন্য রাখা বড়াভাজাগুলে সে সব দিয়ে দিলে অর্তিখর পাতে।

গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবলে পোনে সাত টাকায় বেচারী নিশ্চয়ই আধ পেটা খেয়ে থাকে—

রাত দশটার বেশী নয়। একটু ঠান্ডা ক্লুতটা। আবার এসে দুজনে বসলো নিমগাছের তলায় বাঁশের মাচার। হাবু তামাক স্কেজ এনে দিলে।

দুর্গা পিঁড়ত বললে—এখন কি করি আমরা একটা পরামর্শ দাও তো ভায়া। যে বক্ষ শূঁচি—

গঙ্গাচরণ চিন্তিত নুরে বললে—তাই তো! আমারও তো কেমন কেমন মনে হচ্ছে। কেরানি তেল বাজারে আর পাওয়া থাকে না, আবার কাল থেকে শূঁচি নেশলাইও নাকি নেই।

—সে মরুক গে, যাক কেরাসিন তেল। অশ্বকারে থাকবো। কিন্তু খাবো কি? চাল নাকি মোটেই মিলবে না। দামও চড়বে।

—দাম আরও চড়বে? দশ টাকা হয়েছে, আরও?

—একজন ভালো লোক বলাছিল সেদিন। এই খেলা কিছু কিনে রাখতি পারলে ভাল হোত, কিন্তু শেনৈ সাত টাকা মাইনেতে রোজ্জকার চাল কেনাই কঠিন হয়ে পড়েচে? আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি হোল ও গান্ধের রতিকাস্ত্র ঘোষ। গোলাশালা আছে বাড়ীতে। ধানচাল মজুদ আছে। সেদিন বললাম আমার একমণ চাল দিন, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। তা আধমণ দিতে রাজী হয়েছে।

—আপনার কত চাল লাগে রোজ্জ?

—তা সকালবেলা উঠিল একপালি করে চালির খরচ। খেতে দুবেলায় আট-ন'টি প্রাণী। কি করে চালাই বলো তো ভায়া? ও আধমণ চালে আমার ক'দিন?

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—তার ওপর খাওয়ার যা বহর। অমন যদি সকলের হয় বাড়ীতে, তবে রতিকাস্ত্র ঘোষের বাবাও চাল যুঁগরে পারবে না—

দুর্গা পিঁড়ত কিছুতেই ঘুমুতে যায় না। মাঝে পড়ে গঙ্গাচরণেরও ঘুম হয় না। অর্তিথকে ফেলে রেখে সে একা শূতে যায় কি করে? তার নিজেরও যে ভয় একেবারে না হয়েছে তা নয়।

দুর্গা পিঁড়ত বললে—একটা বিহিত পরামর্শ দাও তো ভায়া। ওখানে একা একা থাকি, যত সব অজ্ঞ মনুষ্যদের মধ্যখানে। আমরা কি পারি? আমরা চাই একটু সংস্ক, বিনে পেটে আছে এমন লোকের সঙ্গে। নরতো প্রাণ যে হাঁপয়ে ওঠে। না কি বল?

—ঠিক ঠিক!

—তাই ভাবলাম যদি পরামর্শ করতে হয় তবে ভায়ার ওখানে যাই। বাজে লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে? তুমি যা বুদ্ধি দিতে পারবে, চম্বাডুঘো লোকের কাছ থেকে সে পরামর্শ পাবো না। যুদ্ধের খবর কি?

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে।

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন? ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর?

—না—ইয়ে—শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ? সে তো—

—যেখন থেকে রেংগুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যে সস্তা, মোটা মোটা আলো চাল, সিংধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

এ আবার এক নতুন খবর বটে। কাল বিশ্বাস মশায়ের চ'র্ডীমণ্ডপে বনে গল্প করবার একটা জিনিষ পাওয়া গেল বটে। উঃ, এ খবরটা সে এত দিন জানে না? কেউ তো বলেও নি। জানেই বা কে এ অজ্ঞ চাষা-গায়ে? তবে গঙ্গাচরণের কাছে সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া। রেংগুন বা ব্রহ্মদেশ ঠিক কোন্ দিকে তা সে জানে না। পূব বা দক্ষিণ দিকে কোন্ জায়গায়। অনেক দূর।

পরদিন দুপুরবেলাতেও দুর্গা পিঁড়ত এখানেই আহার করলে। অনঙ্গ-বোঁ তার জন্য দু'তিন রকমের তরকারি রান্না করলে। খেতে ভালবাসে, ব্রাহ্মণ অর্তিথ। তাদের চেয়ে অনেক গরীব।

অনঙ্গ-বৌ হাৰুকে সকালে উঠেই বলেচে—একটা মোচা নিয়ে আর তো তোর সম্বাদের বাগান থেকে ।

দুর্গাকে মোচা কুটে নেখে গঙ্গাচরণ বললে—আজ যে অর্তিখ সংস্কারের খুব বহর দেখাচি—

—ভারি তো । একটু মোচার ঘণ্ট রাধবো, আর একটু দুর্গানি—

—বেশ বেশ । অর্তিখর দোহাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হয়ে যাবে ।

—হ্যাঁগা, পিঁড়িত মশাই বড় গরীব, না ? দেখে বড় কষ্ট হয় । কি রকম কাপড় পরে এয়েচে, পায়ে জুতো নেই ।

—তা অবস্থা ভালো হলে কি সাত টাকা মাইনেতে পড়ে থাকে পাঠশালায় ! আজ ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও ।

—একটু দুধ যোগাড় করে দেবে ?

—দেখি যদি নিবারণ ঘোষের বাড়ীতে মেলে । ওটা কাঁচকলার মোচা নয় তো, তা'হলে কিন্তু এত তেতো হবে যে মুখে দেওয়া যাবে না তরকারি ।

—নাগো, এ কাঁটালি কলার মোচা । আমাকে তুমি আমার কাজ শেখাতে এসো না বলচি ।

দুর্গাপুরবেলা দুর্গা পিঁড়িত খেতে এসে নপ্রশংস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পাতের দিকে চেয়ে বললে—এ যে রীতিমত ভোজের আয়োজন করেছেন দেখাচি ? আহা, বোমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী । এত সব রেঁধেচেন বসে বসে ? ওমা, কোথায় গেলে গো মা ?

অনঙ্গ-বৌ ঘরে ঢুকে সুকুঁঠিত সলজ্জভাবে দুধ নীচু করে রইল ।

দুর্গা পিঁড়িত ভাল করে মোচার ঘণ্ট নিয়ে অনেকগুলো ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে খেতে বললে—সত্যি, এমন তৃপ্তির সঙ্গে কতকাল খাই নি ।

গঙ্গাচরণের মনে হোল দুর্গা পিঁড়িত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলচে না । ওর স্বরে কপট ভদ্রতা নেই । সত্যি কথাই বলচে ও, এমন কি অনেক দিন পরে ও যেন আজ পেট ভরে দু'টি ভাত খেতে পেলো ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও হাবু, বল আর কি দেবো ? মোচার ঘণ্ট আর একটু আনি ?

পরিশেষে ঘন জ্বাল দেওয়া এক বাটি দুধ আর নতুন আখের গড় । দুর্গা পিঁড়িত সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েচে, খাওয়ার সময় ওর চোখ দুটো যেন কেমন ধরনের চক্চক্ করচে । শীর্ণ চহারা শব্দ বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে । অনঙ্গ-বোয়ের মনে মমতা জন্মালো । তাদের যদি অবস্থা থাকতো দেবার, ইচ্ছে হয় রোজ ওই অনাহার-শীর্ণ দরিদ্র পিঁড়িত মশাইয়ের পাতে এমনিতর নানা ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেয় ।

—আসি বোমা, আপনাদের যত্নের কথা ভোলবো না কখনো । বাড়ী গিয়ে মনে রাখবো ।

অনঙ্গ-বোয়ের চোখ দু'টি অশ্রুসঞ্জন হয়ে উঠলো ।

—যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাই দিও মা অনঙ্গ-বৌ । বস গরীব আনি ।

দুর্গা পিঁড়িতের অপরিশ্রম্য ক্ষীণদেহ আম-শিমুলের বনের ছায়ায় ছায়ায় দু'র থেকে দরাস্তরে গিয়ে পড়লো অনঙ্গ-বোয়ের স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে ।



সেদিন এক বিপদ।

রাধিকানগরের বাজারে পরদিন বহুলোকের সামনে পাঁচু কুড়ুর চালের দোকান লুট হোল। দিনমানে এগন ধরণের ব্যাপার এ সব অঞ্চলে কখনো ঘটে নি। গঙ্গাচরণও লোখানে দাঁড়িয়ে। একটা ষটফলার বড় আটচালাওয়ালা দোকানটা। প্রথমে লোকে সবাই এলো চাল কিনতে, তারপর কিসে যে কি হোল গঙ্গাচরণ জানে না, হঠাৎ দেখা গেল যে দোকানের চারিপাশে একটা হৈঁচৈ গোলমাল। মেলা লোক দোকানে ঢুকচে আর বেরুচ্ছে। ধামা ও খলে হাতে বহুলোক মাঠ ভেঙে বাওড়ের ধারে-ধারের পথে পড়ে ছুটচে। সন্ধ্যার দৌর নেই বোঁশি, সূর্যদেব পাটে বসে-বসে। গাছের মগডালে রাঙা রোদ।

একজন কে বললে—উঃ, দোকানটা কি করেই লুট হচ্ছে।

গঙ্গাচরণও গিয়েছিল চাল কিনতে। হাতে তার চটের খলে। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরে সে দেখলে চালের বাজারে সাড়ে বারো টাকা দর। গত হাটবারেও ছিল দশ টাকা চার আনা, একটা হাটের মধ্যে মগে একেবারে ন'সিকে চড়ে যাবে এ তো স্বপ্নের অগোচর। চাল কিনবে কি না-কিনবে ভাবচে, এমন সময় বিষম হৈঁচৈ।

লোকের ভিড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসচে, সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটচে। কেউ চাল নিয়ে ছুটচে, কেউ শূঁধু হাতে। গঙ্গাচরণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ভাবচে তখনও, চাল কিনবে কিনা—এমন সময় পেছন থেকে দু'জন লোক এসে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লো, তার মধ্যে একজন ওকে জাপটে ধরলে জোর করে ওর চটের খলে সূঁধ। গঙ্গাচরণ চমকে উঠে বললে—কে ? কে ?

কর্কশ কন্ঠে কে একজন অস্পষ্ট দিবালোকে বলে উঠলো—চাল নিয়ে পালাচ্ছো শালা— হাতে-নাতে ধরে'চি !

গঙ্গাচরণ ঝাঁকি মেরে উঠে বললে—কে চাল চুরি করচে ? লোক চেনো না ?

লোক দু'জন ওর সামনে এসে ভাল করে মূখ দেখলে। গঙ্গাচরণ চিনলে ওদের, বন্যোবেড়ের দফাদার সাধুচরণ মন্ডল এবং ঐ ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার। ওরা কিন্তু গঙ্গাচরণকে চেনে না।

চৌকিদার বললে—শালা, লোক সবাই ভালো। সকলকেই আমরা চিনি। চাল ফেনালি ক'নে ?

—আমার নাম গঙ্গাচরণ পিঁড়িত, নতুন গায়ে আমার পাঠশালা। চাল কিনতে এসেছিলো বাপু, ব্রাহ্মণকে যা তা বোলো না। আমায় সবাই চেনে এ দিগরে। ছেড়ে দাও—

সাধুচরণ দফাদার ওর সামনে এসে মূখ ভালো করে দেখে বললে—এ দেখ'চি পুরানো দাগী চোর। এর নাম মনে পড়চে না, বাঁধো একে।

ঠিক সেই সময় নতুন গায়ে তিনজন লোক এসে পড়াতে গঙ্গাচরণ দাগী চোর ও চুরির অভিযোগ থেকে নিস্তার পেলে। এমন হাস্যামে গঙ্গাচরণ পড়ে নি জীবনে।

গঙ্গাচরণের ফিরতে রাত হয়ে গেল সেদিন। অনঙ্গবৌ বসে আছে চালের আশায়। এত রাত কখনো হয় না হাট করতে মেয়ে। ব্যাপার কি ?

ছ. বি. র. সুলভ ৩য়—৩

বিনোদ কাপালীর বোন ভানু এসে বললে—কি করছো ঠাকরুণ দিদি ?

—এসো ভানু । বোসো ভাই—

—দাদাঠাকুর ক'নে ?

—রাধিকানগরে হাটে গিয়েছে, এখনো আসবার নামটি নেই ।

—আজ নাকি খুব হ্যাংনামা হয়ে গিয়েছে হাটে । দাদা ফিরে এয়েছে, তাই বলছিল ।

অনঙ্গ-বো উৎসাহ মূখে বললে—কি হ্যাংনামা রে ভানু ? হয়েছে কি ?

ভানু বললে—কি নাকি চালের দোকান লুঠ হয়েছে, অনেক লোককে পুঁলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে—এই সব ।

অনঙ্গ-বো আশ্চর্য হোল, তার স্বামী লুঠের ব্যাপারে কখনো থাকবে না, সতরাং পুঁলিসে ধরেও নিয়ে যায় নি, হয়তো ওই সব দেখতে দোরি করে ফেলেছে । তবুও সে হাবুকে ডেকে বললে—ও হেবো, একটু এগিয়ে দেখ না—হাট থেকে লোকজন ফিরে এলো । এত দোরি হচ্ছে কেন ?

এমন সময় শূন্য চাপের ধলে হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী চুকে বললে—ওঃ, কি বিপদেই আজ পড়ে গিয়েছিলাম ! আমাকে কিনা ধরেছে চোর বলে !

অনঙ্গ বলে উঠলো—সে কি গো ?

—হ্যাঁ, ওই বনোবেড়ের সাধুচরণ দফাদার আর দু ব্যাটা চোকিদার ।

—ওমা, তারপর ?

—তারপর বাঁধে আর কি । শেষে এ গায়ের লোকজন গিয়ে না পড়লে বেঁধে নিয়ে যেতো ।

—কি সম্বনাশ গা ! মা সাত-ভয়ে কালীর পূজো দেবো স পাঁচ আনা । মা রক্ষা করেচেন ।

—যাক, সে তো গেল এক বিপদ, ইদিকে যে তার চেয়েও বিপদ । চাল পেলাম না হাটে ।

—তুমি ভেবো না, আমি রাতটা চালিয়ে দেবো এক রকমে । কাল দুপুরেও চালাবো । সারাদিনে চাল যোগাড় করে আনতে পারবে এখন খুবই ।

বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ভানুকে বললে—ভানু দিদি, আমায় এক পালি চাল ধার দিতে পারবে আজ রাতের মত ? উনি হাটে গিয়ে হ্যাংনামাতে পড়ে গিয়েছিলেন, চাল কিনতি পায়নি নি ।

ভানু বললে—এখনি পেঁঠিয়ে দিচ্ছি ঠাকরুণ দিদি ।

—না নিলে কিন্তু রাতে ভাত হবে না !

—ওনা, সে কি কথা ঠাকরুণ দিদি, নয়তো আমি নিজে নিয়ে আসাচি ।

ভানু চলে গেল বটে কিন্তু চাল নিয়ে এলো না । এই আসে এই আসে করে প্রায় ঘণ্টা-খানেক কেটে গেল, তখনও ভানুর দেখা নেই । অনঙ্গ-বো আশ্চর্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি ? এই গ্রামে এসে পর্যন্ত যার কাছে যা মুখ ফুটে চেয়েছে সে, তবুনি পরম খুঁশির সঙ্গে সে জিনিসটা এনে দিয়ে স্নেহ কৃতার্ণব হয়ে গিয়েছে । এই প্রথমবার অনঙ্গ-বোকে সামান্য এক কাঠা চাল ধার চেয়ে বিফল হোতে হোল ।

ইদিকে বিপদের ওপর বিপদ, স্বামী হাট থেকে এসে কোথায় স্নেহ বেরিয়ে গেলেন, বোধ

হয় হাটের গল্প বলবার জন্যে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী, কি করেই বা তাঁকে সে জানায় ? এসে খিসের ওপর ভাত খেতে পারে না ।

সাতপাঁচ ভাকচে, এমন সময় ভান্দু উঠোন থেকে ডাকলে—ও ঠাকরুণ দিদি ?

অনঙ্গ-বৌয়ের প্রাণ এল ফিরে । সে তাঁড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে—বালি কি কাণ্ডখানা, হাঁ রে ভান্দু ?

ভান্দু দাঁওয়ার উঠে এসে শুকনো মূখে বললে—ঠাকরুণ দিদি, আমি সেই থেকে চলে যোগাড় করবার জন্যে তিন-চার বাড়ী ঘুরে বোঁড়িয়েছি ।—

—কেন তোদের বাড়ী কি হোল ?

—নেই । হাটে পায় নি আজ ।

—হাটে কেন ? ক্ষেতের ধান ?

—আ মোর কপাল ! ক্ষেতের ধান আর কেন ! ছ'টাকা মণ যেমন হোল, অর্শন কাঁকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ী পুরে । বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে । ফি-জনে জুতো কেনলে, কাপড় কেনলে, কার্কায়া ঘটি বাসন কেনলে, মাছ খালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে । নবাবী করে সে টাকাও উঁড়িয়ে ফেললে । এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই । ক'হাট কিনে খাতি হচ্ছে মোদেরও ।

—অন্য বাড়ী যে ঘুরালি বললি ?

—মোদের পাড়ায় কারো ঘরে ধান নেই ঠাকরুণ দিদি । সব কিনে খাওয়ার ওপর ভরসা । ভান্দু আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে ।

—ওতে কি রে ?

—এক খুঁটি মোটা চাল ওই ক্ষুদে গয়লার নাত-বোঁয়ের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে—

—হ্যাঁ রে, তারা তো বন্ড গরীব । তুই আনলি, তাদের খাবার আছে তো ? দাঁড়া—

—সে আমি না জেনে আনি নি দিদি ঠাকরুণ । ওরা লোকের ধান ভানে কিনা ? আট কাঠা ধানে এক কাঠা ধান বানি পায় । বানির ধান ভেনে খোরাকি চালায় ।

অনঙ্গ-বৌ একটু ভেবে বললে—আমার একটা উপকার করবি ভান্দু ?

—কি ?

—আজ্ঞা সে পরে বলবো এখন । দে চাল ক'টা—

—এক খুঁটি চালি, রাতটা হবে এখন ভো ? আর না হালিই বা কি করবা ঠাকরুণ দিদি ? কত কষ্টে যে চাল ক'টা যোগাড় করে এনিচি ভা আমিই জানি ।

গঙ্গাচরণ ভাত খেতে বসলো অনেক রাতে । ডাল, ভাত আর পইঁশাকের চচ্চড়ি । বাড়ীর উঠোনই সংগৃহণী অনঙ্গ-বৌ পইঁশাক্য তুলে দিয়েছে, লাউমাচা তুলেছে, কিছুর টেঁড়স, কিছুর নটেশাকের ক্ষেত করেছে । হাবু ও নিজে দু'জনে মিলে জল দিয়েছে আগে আগে, তবে এই সব গাছ বেঁচে আজ ভরকারি যোগাচ্ছে ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডাল দিয়ে পেট ভর খাও—

—এ চাল দুটো ছিল বৃষ্টি আগের দরুণ ?

—হঁ ।

—কাল হবে ?

—কাল হবে না । সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো । রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল ।

—সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুণ ধানের চাল !

—হঁ।

অনঙ্গ-বো স্বামী-পুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে সে-রাতে এক ঘাট স্কল আর একটু গড় খেয়ে উপোস করে রইলো ।

দিন পনেরো কেটে গেল ।

গ্রামে গ্রামে লোকের একটু সশ্রুত হয়ে উঠেছে । চাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েছে ।

স্বাধিকানগরের হাটে, যেখানে আগে বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের চাষাদের মেয়েরা ঢৌকি ভানা চাল নিয়ে আসতো, সেখানে আজকাল সাত-আটজন স্ত্রীলোক মাত্র দেখা যায় । তাও চাল পাওয়া যায় না । বড়তলার মোড়ে আর ওদিকে সামটা বিলের ধারে ক্রেতার দল ভিড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চাল কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায় ।

হাটুরে লোকেরা চাল বড় একটা পায় না ।

আজ দু'হাট আদৌ চাল না পেয়ে গঙ্গাচরণ সতর্ক হয়ে এসে সামটা বিলের ধারে দাঁড়িয়েছে একটা বড় জিউর্ডালি গাছের ছায়ায় । সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন লোক আছে বিভিন্ন গ্রামের । বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে । রোদ খুব চড়া ।

কম্বা গ্রামের নবীন পাড়ুই বলচে—বাবাঠাকুর, আমরা তো ভাত না খেয়ে থাকার্ত পারি নে, আজ তিন দিন ঘরে চাল নেই ।

গঙ্গাচরণ বললে—আমার ঘরে আজ দু'দিন চাল নেই ।

আর একজন বললে—আমাদের দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নি ।

নবীন পাড়ুই বললে—কি খেল ?

—কি আর খাবো ? ভাগ্যিস মাগীনরা দুটো চি'ড়ে কুটে রেখেছিল সেই বোণেখ মাসে, তাই দুটো করে খাওয়া হচ্ছে । ছেলের পলে ভো আর শোনবে না, তারা ভরপেট খায়, আমরা খাই আধপেটা ।

—তা চি'ড়ের সেরও দেখতি দেখতি হয়ে গেল বারো আনা, যা ছিল দু'আনা ।

—এ কি বিশ্বাস বরতি পারা যায় ? কখনো কেউ দেখেচে না শূনেচে যে চি'ড়ের সের বারো আনা হবে ?

গঙ্গাচরণ বললে—কখনো কি কেউ শূনেচে যে চালের মণ ষোল টাকা হবে ?

নবীন পাড়ুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চূপ করে রইল । সে জোরান মানুষ যদিও তার বয়স থেকে পঞ্চাশের কেঠায় ; যেমন বৃকের ছাঁত, তেমন বাহুর পেশী । ভুতের মত পরিভ্রম করলে যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তবে আর বে'চে সুখ কি ? আজ দু'তিন দিন তাই জুটেচে ওর ভাগ্যে ।

এমন সময় দেখা গেল আকাইপুত্রের মাঠের পথ বেয়ে তিন-চারটি স্ত্রীলোক চালের ধামা, কেউ বা বস্তা মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠলো ।

নবী এগিয়ে চললো অর্মান ।

মহুর্তমধ্যে উপস্থিত পট-ছ'জনের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কতটা চাল কিনতে পারে ! হঠাৎ ওদের মধ্যে কার যেন মনে পড়লো; কথাটা, সে জিগ্যেস করলে—কত করে পালি ?

একজন চালওয়ালী বললে—পাঁচ সিকে ।

গম্গাচরণ এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল, পাঁচ সিকে পালি, অর্থাৎ কুড়ি কা মণ !

নবীন পাড়ুইয়ের মুখ শর্কিয়ে গেল, সে একটা টাকা এনেচে—পাঁচ সিকে না হোলে এক গঠা চাল কেউ বিক্রি করবে না । এক টাকার চাল কেউ দেবে না ।

এরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলো দেখলে যে চাল যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে এই বেলা । বলস্বে হতাশ হতে হবে । আরও পাঁচ-ছ'জন ক্রেতাকে দূরে আসতে দেখা যাচ্ছে ।

দু'জন লোক এদের মধ্যে নিরুপায় । ওদের হাতে বেশি পয়সা নেই । সুতরাং চাল কনবার আশা ওদের ছাড়তে হোল । এই দলে নবীন পাড়ুই পড়ে গেল ।

গম্গাচরণ বললে—নবীন, চাল নেবে না ?

—না বাবাঠাকুর, একটা সিকি কম পড়ে গেল ।

—তবে তো মর্শকিল । আমার কাছেও নেই যে তোমাকে দেবো ।

—আধসের পুঁটিমাছ ধরেলাম সামটার বিলে । পেয়েলাম ছ'আনা । আর কাল মাছ কেঁবার দরুন ছিল দশ আনা । কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতে । তা আবার চালের দাম চড়ে গেল কি করে জানবো ?

—তাই তো !

—আধপেটা খেয়ে অছি দু'দিন । জাষীদের ঘরে ভাত আছে, আমাদের ভা নেই । আমাদের কষ্ট সকলের অপেক্ষা বেশি । জলের প্রাণী, তার ওপর তো জোর নেই ? ধরা না দিলে কি কর্যচি । যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম, যেদিন পালাম না সেদিন উপোস । আগে ধান চাল ধার দিতো, আজকাল কেউ কিছু দেয় না ।

গম্গাচরণ কঠাদুই চাল সংগ্রহ করেছিল কাড়াকাড়ি করে । তার ইচ্ছে হোল একবার এই চাল থেকে নবীন পাড়ুইকে সে কিছু দেয় । কিন্তু তা কি করে দেওয়া যায়, চালের অভাবে হয়তো উপোস করে থাকতে হবে কালই । গ্রামে ধান চাল মেলে না যে তা নয়, মেলে অতি কষ্টে । ধান চাল থাকলেও নোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে ।

নবীন পাড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে গম্গাচরণ রাধিকানগরের বাজারে এল । এক টাকার চালই কিনে দেবে তাকে । দোকান ছাড়া তো হবে না । কিন্তু মর্শকিলের ব্যাপার, বড় বড় তিন-চারিটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি—চাল নেই ।

গম্গাচরণের মনে পড়লো বৃন্দ কুঁড়ু মশায়ের কথা । এই গত বৈশাখ মাসেও কুঁড়ু মশায়ের দোকানের সামনে নিয়ে যাচ্ছে সে, কুঁড়ু মশাই তাঁকে তেঁকে আদর করে তামাক সেজে খাইয়ে বলেচে—পাঁচত মশাই, আমার দোকান থেকে চাল নেবেন, ভাল চাল আনিয়োঁচি । কত খাতির করেচে ।

কুঁড়ু মশায়ের দোকানে গেলে ফিরতে হবে না, ঠিক পাওয়া যাবেই । কিন্তু সেখানেও তখৈবচ, গম্গাচরণ দোকানঘরটিতে ঢুকবার সময় চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যে বাঁশের মাচার চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে ।

বৃন্দ কুঁড়ু মশায় প্রণাম করে বললে—আনুন, কি মনে করে ?

অভার্থনার মধ্যে বৈশাখ মাসের আশ্চর্যকতা নেই যেন । প্রধানটা নিতান্ত দায়সারা গোছের ।

গম্গাচরণ বললে—কিছু চাল দিতে হবে ।

—কোথায় পাবো, নেই।

—এক টাকার চাল, বেশ নয়। এই লোকটাকে উপাস করে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় সব নিচু করে বললে—সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চাল দিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে—ধান চাল কোথায় গেল? আপনার এত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁকা কেন?

—কি করবো বাপু, সেদিন পাঁচু কুণ্ডুর শোকান লুঠ হবার পর কি করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন! সবারই সে দশা। তার ওপর শুনচি পুঁলিসে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্যে।

—কে বললে?

—বলচে সবাই। গদুজব উঠেচ বাজারে। আপনার কাছে মিথো বলবো না, চাল আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেখে দিইচি। কিন্তু লোকের কাছে কবুল যাবো না, আপনাকে তাই বললাম, অন্যকে কি বলি?

—আমরা না খেয়ে মরবো?

—যদিই থাকবে, দেবো। তবে আমার জামাই গরুরগাড়ী করে বন্দবাসিটার হাটে কিছু চাল নিয়ে যেতে চাইচে। তাই ভাবচি।

—পাঠাবেন না, লুঠ হবে পথে। বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে। কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ?

—বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েছে গবর্ণমেন্টের কন্ট্রোলারদের কাছে। এক দানা ধান রাখি নি। এই রকম অনেকেই করেছে খবর নিয়ে দেখুন। আমি তো চুনোপাট দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট মণ মাল আমার বিদ্যে।

গঙ্গাচরণ সম্ভার অশ্বকরে চিন্তাশ্রম মনে বাড়ীর পথে চললো।

নবীন পাড়ুই সঙ্গেই ছিল, তাকে যেতে হবে দোমোহানী, নতুন গাঁয়ের পাশেই। বললে—পাণ্ডিত মশাই ছেলেন তাই আজ বাচকাচের মূখে দুটো দানা পড়বে। মোদের কথা ওসব বড় দোকানদার কি শোনে! মোরা হলাম টিকার মানুষ। কাল দুটো মাছ পেটিয়ে দেবো আনে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী নেই, পাঠশালায় গিয়েছে পড়াতে। হাবু ও পটল বাপের সঙ্গে পাঠশালায়। একা অনঙ্গ-বো রয়েছে বাড়ীতে। কে এসে ডাক দিলে—ও পাণ্ডিত মশাই—বাড়ীতে আছ গা—

অনঙ্গ-বো কারো সামনে বড় একটা ব্যর্থ হয় না। বৃন্দ ব্যক্তি ডাকডাকি করছে দেখে মোরের কাছে এসে মদুস্বরে বললে—উঁহ বাড়ী নেই। পাঠশালায় গিয়েচেন—

—কে? মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ সনাক্ত ভাবে চুপ করে রইল।

বৃন্দটি দাওয়াল উঠে বসে বললে—আমায় একটু খাবার জল দিতি পারবা মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘরের মরো ঢুকে এক ঘটি জন নিয়ে এসে রাখলে। তারপর বাড়ীর গামছাখানা বেশ করে ধুয়ে ঘটির ওপর রেখে দিলে। একটু আখের গুড় ও এক গ্লাস জনও নিয়ে এল।

বললে—দু'কোষ কাঁটাল দেবো ?

—খাজা না রসা ?

—অধখাজা। এখন শ্রাবণ মাসে রসা কাঁটাল বড় একটা থাকে না।

—দাও, নিয়ে এসো—মা, একটা কথা—

—কি বলুন ?

—আমি এখানে দু'টো খাষো। আমি ব্রাহ্মণ। আমার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। বাড়ী কামদেবপুরের সন্নিকট বাগান-গা।

অনঙ্গ-বো বললে—খাবেন বই কি। বেশ, একটু জিঁরয়ে নিন। ঠাই করে দি— একটু পরে দীনু ভট্টাচার্য মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত, চেঁড়সভাজা, বেগুন ও শাকের ডাটাচর্চাড়ি দিয়ে অভ্যস্ত ভূঁস্তুর সঙ্গে খাচ্ছিল। অনঙ্গ-বো বিনীতভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু খেতে খেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন একটু দম নিলে। তার পর বললে—মা-লক্ষ্মীর রান্না যেন অমর্ত্যে। চর্চাড়ি আর একটু দাও তো ?

অনঙ্গ লজ্জা কুঁঠত স্বরে বললে—আর তো নেই ! চেঁড়সভাজা দু'খানা দেবো ?

—তাই দাও মা।

এত বৃন্দ লোক যে এতগুলো ভাত এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতে পারে, অনঙ্গ-বো নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতো না। বললে—আর ভাত দেবো ?

—তা দু'টো দাও মা।

—মুশকিল হয়েছে, খাবেন কি দিয়ে ! তরকারি বাড়ন্ত।

—তেঁতুল এক গটি দিতি পারবা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরা হোলাম গিয়ে গরীব মানুষ। সব দিন কি মাছ-তরকারী জোটে ? কোনো দিন হোল না, তেঁতুল এক গটি দিয়ে এক পাতর ভাত মেয়ে দেলাম—

অনঙ্গের ভাল লাগছিল এই পিতার বয়সী সরল বৃন্দের কথাবার্তা। ইনি বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। বলতে নেই, কি রকম গোগ্রাসে ভাত কটা খেয়ে ফেললেন। আরও থাকলে আরও খেতে পারতেন বোধ হয়। কিন্তু বৃন্দ দু'গুণের বিষয়, ভাত-তরকারী আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অনঙ্গ বললে—তামাক সেজে দেবো ?

—তোমাকে দিয়ে তামাক সাজাষো মা-লক্ষ্মী ? না—না—কোথায় তামাক বলো। আমি নিজে বলে তামাক সাজাতি সাজাতি বড়ো হয়ে গেলাম। উনসস্তর বছর বয়েন হোল।

—উনসস্তর ?

—হ্যাঁ। এই আশ্বিন মাসে সস্তর পোরবে। তোমরা তো আমার নাভনারি বয়সী।

দীনু ভট্টাচার্য হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলো কথার শেষে।

অনঙ্গ-বো নিজের তামাক সেজে কল্কায় ফুঁ দিতে দিতে এল, ওর গাল দু'টি ফুলে উঠেচে, আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠেচে।

দীনু শশবাক্তে বললেন—ওকি, ও কি,—এই দ্যাখো মা-লক্ষ্মীর কান্ড !

—তাতে কি ? এই তো বললেন—আমাকে নাতনীর সমবয়সী !

—না না, ওটা ভালো না। মা-লক্ষ্মী তুমি কেন তামাক সাজবে ? ওটা আমি পছন্দ করি নে—দ্যাও হুকো আমার হাতে। ফুঁ দিতি হবে না।

অনঙ্গ-বো! একটা হাদুর ও বালিশ নিয়ে এসে পেতে দিয়ে বনলে—গড়িয়ে নিন একটু।

বেলা পাঁচটার সময় পাঠশালার ছুটি দিলে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে কে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দাওয়ায় শয়ে থাকতে দেখে কিছু বৃদ্ধতে পারলে না। পরে স্ত্রীর কাছে সব শুনলে বললে—ও, কামদেবপুত্রের সেই বৃদ্ধো ভট্টাচার্য! চিনেচি এবার। কিন্তু তুমি তা হোলো না খেয়ে আছ ?

অনঙ্গ বললে—আহা, আমি তো যা-তা খেয়েই এক বেলা কাটাতে পারি। কিন্তু বৃদ্ধো বামন, ওর না-খাওয়ার কষ্টটা—

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু যা-তা খেয়ে যে কাটাবে—যা-তা ঘরে ছিগ্নই বা কি ?

—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

স্ত্রীকে গঙ্গাচরণ খুব ভালো করেই জানে। ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মূর্খের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত। অথচ মূখ ফুটে বলবে না কখনো কি খেয়েচে না খেয়েচে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মর্শকিলের কান্ড। কত কষ্টে গভ হাটে চাল যোগাড় করেছিল সে-ই জানে।

ইতিমধ্যে দীনু ভট্টাচার্য ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। বললে—এই যে পান্ডিত মশাই !

গঙ্গাচরণ দু' হাত জুড়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার। ভাল ?

দীনু হেসে বললে—মা-লক্ষ্মীর হাতে অন্ন খেয়ে আপাতোক খুবই ভালো। বড় জমিয়ে নিয়েচি। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী !

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—ওর মাথটি খেলে কেউ লক্ষ্মী, কেউ অন্নপূর্ণা বলে। আমি এখন মাঝে পড়ে মারা যাই।

মুখে বললে—হে' হে', তা বেশ—তা আর কি—

—কোথা থেকে ফিরলেন ?

—পাঠশালা থেকে।

—আমি একটু বিপদে পড়ে পরামর্শ করতে এলাম পান্ডিত মশায়।

—কি বলুন ?

—বলবো কি, বলতি লজ্জা হয়। চাল অভাবে সপত্রী উপোস করতে হচ্ছে। কম দুঃখে পড়ে আপনার কাছ আসি নি।

—কামদেবপুত্রের মিলচে না ?

—আমাদের ওরিক কেনো গিয়ে না। আর যদিও থাকে তো দেড় টাকা করে কাটা বলছে। এ কি হোল বেশে ? আমার বাড়ী চার-পাঁচজন পুঁষা। দেড় টাকা চালের কাটা কিনে খাওয়াতে পারি আমি ?

—এদিকেও তো ওই রকম ভট্টাচার্য মশায়। আমাদের গিয়েও তাই।

—বলেন কি ?



—ঠিক তাই। ও হাটে অতি কষ্টে দু'কাঠা চাল কিনে এনেছিলাম।

—ধান ?

—ধান কেউ বিক্রি করছে না। করলেও ন' টাকা সাড়ে ন' টাকা মগ।

—এর উপায় কি হবে পণ্ডিত মশায় ? আপনি বসুন, সেই পরামর্শ করতি তো আমার আসা। সত্যি কথা বলতি কি আপনার কাছে, কাল রতি আমার খাওয়া হয় নি। চাল ছিল না ঘরে। মা-লক্ষ্মীর কাছে অন্ন খেয়ে বাঁচলাম। বড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্য করতে পারি নে আর।

—কি বলি বলুন, শুনলে বড় কষ্ট হোল। করবারও তো নেই কিছ। আমাদের গ্রামের অবস্থাও তখিবাচ।

দীনু ভট্টাচার্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখিচি।

গঙ্গাচরণ বললে—তাই তো পণ্ডিত মশাই, কি যে করি, বৃদ্ধে তো কিছ পারি নে। তা ছাড়া আপনার গারের ব্যবস্থা এখন থেকে কি করে করা যাবে ! কতটা চাল চান ? চলুন দিক একবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী !

কিন্তু বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী যাওয়া হবে কি, দীনু ভট্টাচার্য ঘানমুখে বললে—তাই তো, পরসাকড়ি তো আনি নি।

গঙ্গাচরণ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আনেন নি, তবে আর কি হবে ? কি করতে পারি আমি ?

গঙ্গাচরণ বোধ হয় একটু কড়া সুরে বলে ফেলিছিল কথাটা।

দীনু ভট্টাচার্য হতাশভাবে বললে—তাই তো, এবারডা দেখিচি সত্যিই না খেয়ে মরতি হবে।

গঙ্গাচরণ ভাবলে—ভাল মূশকিল ! তুমি না খেয়ে মরবে তা আমি কি করবো ? আমার কি দোষ ?

এই সময় অনঙ্গ-বৌ দোরের আড়াল থেকে হাতনাড়া দিয়ে গঙ্গাচরণকে ডাকলে।

গঙ্গাচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বললে—কি বলচ ?

—জিজ্ঞেস করো উনি কি এখন দুখানা পাকা কাঁকড় খাবেন ? ঘরে আর তো কিছ নেই।

—থাকে তো দাও না। জিজ্ঞেস করতে হবে না। ফুটি কাঁকড় কি দিয়ে দেবে ? গুড় বা চিনি কিছই তো নেই।

—সে ব্যবস্থার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সে আমি দেখিচি। আর একটা কথা শোনো। উনি অমন দুঃখ করছেন বড়ো বয়সে না খেয়ে মরবেন বলে, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের বাড়ী এয়েচেন কেন, একটা হিল্ল হবে বলেই তো। আমি দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। বড়ো বামন আমাদের বাড়ী থেকে শূধ হাতে শূধ মুখে ফিরে গেলে অকল্যাণ হবে না ! তা ছাড়া যখন আমাদের আশা করে এতটা পথ উনি এয়েচেন, এর একটা উপায় না করলে হয় ?

গঙ্গাচরণ বিরক্ত মুখে বললে—কি উপায় হবে ? খালি হাতে এসেচে বড়ো ! ও বড় বাড়িবাড়। একদিন অর্শান কামদেবপুর থেকে ফিরবার পথে চালগুলো নিয়ে নিলে—

অনঙ্গ-বৌ জিভ কেটে বললে—ছিঃ ছিঃ—অতিথি নারায়ণ। আমার বাড়ী উঁন এয়েচেন, আমাদের কত ভাণ্ডা? ও কথাটি বোলো না। অতিথিকে অমন কথা বলতে আছে? কাকে কি যে বোলো। নিয়েচেন চাল, নিয়েচেন। আমাদের বাপের ব্যয়সী মানুস। ওঁকে অমন বোলো না—

—তা তো বুঝলাম, বলবো না! কিন্তু পরসো না থাকলে চাল খান পাবো কোথায়?

—উঁন কি বলেন দ্যাখো—

—উঁন যা বলবেন বোঝাই গিয়েচে। উঁন এয়েচেন ভিক্ষে করতে, সোজা কথা। মেগে পেতে বেড়ানোই ওঁর স্বভাব।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার ওই সব কথা?

—তা আমি কি করব এখন? বোলো তাই করি।

—শুধু হাতে উঁন না ফেরেন। বাপের ব্যয়সী বামন। না হয় আমার হাতের পেটি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে ওঁকে চাল কিনে দাও। দিতেই হবে, না দিলে আমি মাথা ঝুঁড়ে মরবো। চাল তো আমাদেরও কিনতে হবে। রাতে রান্না হবে না।

গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল, অনঙ্গ-বৌ বললে—পাকা কাঁকুড় দুখানা খেয়ে যাও। বোরিও না।

গঙ্গাচরণ বিরাঙ্কুর সুরে বললে—আমি বিনি মিন্টিতে ফুটি কাঁকুড় খেতে পারি নে। ওসব বাঙালে খাওয়া তোমরা খাও।

অনঙ্গ-বৌ সকৌতুক হাসি হাসি চোখ নাচিয়ে বললে—বাঙাল বাঙাল করো না বলচি, ভাল হবে না! আমি বাঙাল, আর উঁন এসেচেন একেবারে মক্‌সুদোবাদ জেলা থেকে—

—সে আবার কি গো? ও কথা তুমি আবার কোথায় শিখলে?

—শিখতে হয় গো, শিখতে হয়। সেই যে ভাতছালার উস্তুরে ঘরামি জন ঘর ছাইতে আসতো, মনে পড়ে? ওরা বলতো না, মা, আমাদের বাড়ী মক্‌সুদোবাদ জেলা—  
হি-হি-হি—

একটু পরে বাইরের দাওয়ায় বসে দীনু ও গঙ্গাচরণ দু'জনেই পাকা ফুটি কাঁকুড় খাচ্ছিল খেজুরগুড়ের সঙ্গে। কোথায় অনঙ্গ-বৌ একটু খেজুরগুড় লুকিয়ে সন্ধ্য করে রেখেছিল সময় অসময়ের জন্যে। অনঙ্গ-বৌ ওই রকম রেখে থাকে। গঙ্গাচরণ জানে, অনেক সময় জিনিসপত্র ভেদকিবাঁজির মত বার করে অনঙ্গ।

দীনু ভট্‌চায় কাঁসার বাটী থেকে গুড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—  
আহা, খেজুরগুড়ের মূখ এবার আর দেখি নি।

গঙ্গাচরণ বললে—তা বটে।

—আগে আগে পাঁড়ত নশায়, গুড় আমাদের কিনতি হোত না। মূচিপাড়ায় বানে খেজুর রস জাল দিতো, ঘটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালি আধ সের এক সের গুড় এমান খেতি দিতো। সে সব দিন কোথায় যে গেল!

গঙ্গাচরণ বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেই অনঙ্গ-বৌ দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—কাঁকুড় কেমন খেলেন?

—চমৎকার মা চমৎকার। তুমি সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, কি আর বলবো তোমার। একটা কথা বলবো?

—কি বলুন না ?

—না একটু চা করে দিতি পারো ?

অনঙ্গ-বো: বিপন্ন মুখে বললে—চা ?

—কতদিন চা খাই নি। মাসখানেক আগে সবাইপরের গাঙ্গুলীবাড়ী গিয়ে একদিন চা খেয়েছিলাম। চা আমার বহু খেতি ভাল লাগে। আগে আগে বহু খ্যাতম। এদান হাতে পরমা অনটন, ভাতই জোটে না বলে চা ! আছে কি ?

অনঙ্গ-বো ভেবে বললে—আচ্ছা, আপনি বসুন—

হাবুকে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—হারে, কাপাসীর মা'র বাড়ী ছুটে যা তো। আমার নাম করে বলগে, একটু চা দাও। যদি সেখানে না থাকে, তবে শিবু ঘোষদের বাড়ী যাব। চা আনতি হবে বাবা।

হাবু বললে—ও বড়ো কে মা ?

—বাঃ, বড়ো বড়ো কি রে ? ও রকম বলতে আছে ? বাড়ীতে নোক এলে তাকে মেনে চলতে হয়, শিখে রাখো।

—হা মা, চা কি দিয়ে হবে ? চিনি নেই যে—

—তোর সে ভাবনায় দরকার কি ? তুই যা বাপু, চা একটু এনে দে—

আধঘণ্টা পরে প্রফুল্লবদনে দীনু ভট্টাচার্যের সামনে হাসি হাসি মুখে চায়ের গ্লাস স্থাপন করে অনঙ্গ-বো বললে—দেখুন ভো কেমন হয়েছে ? সত্যি কথা, চায়ের পাটাপাট তেমন তো নেই এ বাড়ীতে। কেমন চা করলাম কে জানে ?

দীনু ভট্টাচার্য চাপুর্গে কাসারে গ্লাস কোঁচার কাপড়ে জড়িয়ে দু-হাতে ধরে এক চুমুক দিয়ে চোখ বৃজে বললে—বাঃ, কেশ কেশ মা-লক্ষ্মী—এই আমার অমর্ত্য। দিব্য হয়েছে—

এই সময় গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললে—চলো, ওঁদিকে একটা কথা শোনো।

অনঙ্গ-বো আড়ালে এসে নিচু সুরে বললে—কি ?

—চাল আনলাম এক কাঠা বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে। আর ধারে তিন কাঠা ধানের বাবস্থা করে এলাম। দীনু ভট্টাচার্যকে কাল সকালে এনে দেবো। আজ আর বড়ো নড়চ না দেখাচি। ও খাচ্ছে কি ? চা নাকি ? কোথায় পেলে ? বড়ো আছে দেখাচি ভালোই। আর কি নড়ে এখান থেকে ?

—তোমার অত সম্বন্ধে দরকার কি ? তুমি একটু চা খাবে ? দাঁচ। আর ও'কে অমন বোলো না। বলতে নেই। বড়ো বামুন অর্তির্থা—ছিঃ—

গঙ্গাচরণ মুখবিকৃত করে অর্তির্থাধর প্রতি হ্রস্বস্বাপন করলে। মুখে বললে—ওঃ, ভারি আমার অর্তির্থা রে !

ধমক দিয়ে অনঙ্গ-বো বললে—কর ? আবার ?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে গ্রামের অনেকগুণ লোক জুটেছে। ঘন ঘন তামাক চলছে।

হাঁরু কাপালী বলছে—আমাদের কিছু ধান দ্যান বিশ্বেস মশাই, নয়তো আমরা না খেয়ে মলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ পাঁচ-ছ'জন লোক ওই এক কথাই বললে। ধান দিতে হবে, না দিলে তাদের পরিবারে অনাহার শুরুর হবে।

বিশ্বাস মশাই বললেন—নিয়ে যাও গোলা থেকে। যা আছে, দু-পাঁচ আড়ি করে এক এক সনের হবে এখন। বতক্ষণ আমার আছে, ততক্ষণ তোমাদের দিলে তো যাই, তারপর যা হয়।

গঙ্গাচরণও ধানের জন্যে দরবার করতে গিয়েছিল। তাকে বিশ্বাস মশায় বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্তৃ' হিসেবে ধান আর কি দেবো? পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।

গঙ্গাচরণ বিস্মিত হোল বিশ্বাস মশায়ের কথায়। যার গোলাভর্তি ধান, যাত্র এই কয় জন লোককে সামান্য কিছু ধান দিয়ে তার গোলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কেমন কথা হোল?

পথে তাকে হীরু কাপালী গোপনে বললে—বিশ্বাস মশায় ধান সব লুকিয়ে সন্নিবে ফেলে দিয়েছে পঁ-ভত মশাই। পাছে মোদের দাঁত হয় সেই ভয়ে। দু' পোটি ধান ধরে হাতীর মত গোলা—ধান নেই কি রকম?

—তোমরা তো ধান নিলে, কি রকম দেখলে গোলায়?

—গোলা সাবাড় পঁভত মশাই, নিজের চোকে দেখি এলাম। এক দানা নেই ওর মাথা।

—তাই তো!

—এবার এই ধান কটা ফুরুলি না খেয়ে মরতি হবে—

—কেন, ভাপ্ত মাসের দশ-বারো তারিখের মধ্যে আউল ধান পেকে উঠে। ভাবনা চলে যাবে তখন।

—তা কি হয় পঁভত মশাই? নতুন ধানের চাল খেলি সদা কলরা। দেখবেন তাই লোকে খাবে পেটের জ্বালায় আর পট্-পট্ মরবে। ও চাল কি এখন খাওয়া যাবে—না পেটে সর্দি হবে? ও খেতি পারা যাবে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিক।

—তবে উপায় কি হবে লোকের?

—এবার যে রকমড়া দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। না খেয়ে আবার লোক মরে? কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেছে। জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে?

অন্য-বো বললে—ও কটা ধান আমি নিজেই ভেঁনে কুটে নেবো ঢেঁকিতে। ওর জন্যে আর কারো খোশামান করতে হবে না। কিন্তু ওতে কদিন চলবে?

—তাই তো আমিও ভাবিচি।

—আমি একটু কথা ভাবিচি। অন্য লোকের চাল কেন আমি ভেঁনে দেই না? বানি পাবো দু'কটা করে চাল মগে।

—ছিঃ ছিঃ, দু'কাটা চাল বানি দেবে তার জন্যে তুমি লগ আড়ি ধান ভানতে যাবে? অত কষ্ট করে দরকার নেই।

—কষ্ট আর কি? দু'কাটা চালের দাম কত আজকাল! আমি তা ছাড়বো না। দু'কাটা চাল বুঝি ফেলনা!

—লোকে কি বলবে বল তো ?

—বলুক গে । আমার সংসারে যদি দু'কাঠা চালের সাশ্রয় হয় তবে লোকের কথাতে কি আসে যাচ্ছে ?

—তুমি যা ভাল বোঝো কর, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীর টিকবে না ।

—সে তোমার দেখতে হবে না ।

তারপর অনঙ্গ-বো হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে ঘাড় দু'লিয়ে দু'লিয়ে বললে—তোমার ঠাকরোঁচি গো তোমার ঠাকরোঁচি ।

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ঠাকরোঁচ ?

—ঠাকরোঁচি মানে চোখে ধুলো দিইচি ।

—কেন ?

—কত দিন আগে থেকে আমি ধান ভানচি ।

—সত্যি ?

—সত্যি গো সত্যি । নইলে চালের হিসেব নিয়ে দেখো । দু' কাঠা চাল তো হাট থেকে কিনেছিলে । কত দিন খেলে মনে নেই ?

—আমার না জানিয়ে কেন অমন করছো তুমি ? ছিঃ ছিঃ—কানের ধান ভানো ?

—হরি কাপালীদের । শ্যাম বিশ্বসদের ।

—ক'কাঠা চালের জন্যে কেন কষ্ট করা ? ওতে মান থাকে না । ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা ? লোকে জানলে কি বলবে বল তো ? এত ছোট নজর তোমার হোল কেমন করে তাই ভাবচি ।

—বেশ, লোকে আমার বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দু' মূঠো পেট ভরে খেতে পারে । তা ছাড়া কাপালীদের দুই বো ধান এলে দেয় । আমি শূদ্ধ ঢেঁকিতে পাড় দিই ।

—তুমি ধান এলে দিতে পারো ? এলে দেওয়া বহু শক্ত না ?

—এলে দেওয়া শিখতে হয় । তাড়াতাড়ি গড় থেকে যে হাত উঠিয়ে নিতে পারে সে ভাল এলে দিতে পারে । এলে দেওয়ানো শিখিচি একটু একটু ।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথায় ভাবনায় পড়ে গেল । তার স্ত্রী যে তাকে লুকিয়ে এ কাজ করছে তা সে জানতো না । মাঝে মাঝে সে ভেবেচে অবিশ্য, মাত্র দু' কাঠা এক কাঠা চালে তার এক হাট থেকে আর এক হাট পর্যন্ত চলচে কি করে ? এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে অনঙ্গ-বো চালান্চে তা তো সে জানতো না !

আহা, বোচরী ! যদি ধান এলে দিতে গিয়ে কোনদিন ওর আঙুলে ঢেঁকি পড়ে যায় ?

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বোরিয়ে গেলে হরি কাপালীর ছোট বো এসে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে—উনি চলে গিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, দাঁদি । যাই—

—চলো বামুন-বো, ওরা সব বলে আছে তোমার জ্যানি ।

—কত ধান আনকে ?

—পাঁচ আড় তিন কাঠা । চিড়ে আছে তিন কাঠা ।

—আমাকে ধান এলে দেওয়া শিখিয়ে দিবি দাঁদি ?

—সে তোমার কাজ নয়। অমন চাঁপামূলের কলির মত আঙুল, ঢেঁকি পড়ে ছেঁতে মাঝে। তার দায়িক আমি হবো বৃষ্টি বামুন-বো?

—দায়িক হতে হবে না সের্জানি। আহা, ভীষণ দেখে না! মরণের ভগ্নদশা!

কাপালী-বো অনঙ্গ-বোয়ের দিকে চোখ মিটকি মারছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করেই অনঙ্গ-বোয়ের শেষের উঁকটুকু; হরি কাপালীর ছোট বোয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, রংও ফর্সা, মূখ-চোখের চটক ও দেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।

অনঙ্গ হেসে বললে—আড়চোখ দেখাণে অন্য জায়গায়—বহুলোকের মন্থু ঘুরিয়ে দিতে পারবি।

কাপালী-বো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—মন্থু ঘুরিয়ে বেড়ানো বৃষ্টি আমার কাজ?

—কি জ্ঞানি দিদি?

—আর তুমি বামুন-বো—তুমি যে অনেক মূনির মন টালিয়ে দিতে পারো মন করলি? আমরা তো তোমার পায়ের নখের ঘূর্ণি; নই। সামনে খোশামোদ করে বলিচি নে বামুন-বো। গ্রামের সবাই বলে—

অনঙ্গ-বো সলঙ্ক হাসি মুখে বললে—যাঃ—

হরি কাপালীর দূ'খানা মেটে ঘর, একদিকে পুঁইমাচা, একদিকে বেড়ার মধ্যে লালডাটা ঝিঙে ও বেগুনের চাষ। পুঁইমাচার পাশে ছোট চালার নিচে ঢেঁকি পাতা। সেখানে জড়ো হয়েছে হরি কাপালীর বড়-বো, আরও পাড়ার দু'তিনটি ঝি-বো। ঢেঁকিঘরের চারপাশে বর্ষাপুষ্ট বনকচুর ঝড়, ধুতরো গাছ, আদাড় বাগ গাছে রাঙা রাঙা মটর ফল, ঢেঁকিঘরের চালে তেলাকুচো লতা উঠে দুলছে, বর্ষাসজল হাওয়ায় কচি লতাপাতার গন্ধ।

অনঙ্গ-বো আর ছোট-বো সেখানে পেঁছতে সবাই ঝুব ঝুশি।

বড়-বো বললে—এসো বামুন-বো, তুমি না এলি ঢেঁকিশেলের মজলিশ আমাদের ক্রমে না—

ক্ষিত্তুরী কাপালী বললে—যা বললে দিদি, ঠাকরুণ-দিদি আমাদের ঢেঁকিশেল আলো করে থাকেন। আমাদের বৃষ্টির মাঝি হু-হু করতি থাকে উঁনি না এলি—

অনঙ্গ-বো হেসে বললে—তোমাদের বশু দরদ দেখছি—

ছোট-বো বললে—আমিও তা বলিছিলাম, বামুন-বোয়ের রাঙা পায়ের তলায় পড়ে আমি মরতি পারি—

বড়-বো বললে—সে তো ভাগিা—বামুনের এরিস্ত্রী বোয়ের পায়ের মরবার ভাগিা চাই রে ছুটকি। সে এমনি হয় না।

এদের দু'পূরের মজলিশ ক্রমে উঠলো।

কাপালীপাড়ার বো-ঝিয়েদের এই একমাত্র আমোদ-আহ্লাদের স্থান। এখানে না এলে ওদের দু'পূরেটা মিথে; হয়ে যায় যেন। পাড়াগায়ের গৃহস্থঘরের মেয়ে, দু'পূরে এদের দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নেই, সময়ও পায় না। ধান ভানা চিঁড়ে কোটাতেই অবসর সময় কেটে যায়, ওর মধ্যেই এদের আচ্ছা, গল্পগুজব যা কিছু।

অনঙ্গ-বো বললে—বড়-বো, ও ধান কানের?

—কাল উনি কোথেকে কত কষ্টে পাঁচ কাঠা ধান এনেলেন—কিন্তু শুনচি ধান নাকি সব গবরমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে ?

—কে বললে ?

—উনি কাল হাট থেকে নাকি শুনেন এয়েচেন ।

ছোট-বো বললে—ওসব কথা এখন রাখো দিদি । বামুন-বোয়ের জন্যে একটা পান সেজে নিয়ে এসো দিকি ।

—পান আছে, সুপুঁরি নেই যে ? কাল হাটে একটা সুপুঁরির দাম দু'পয়সা ।

সিন্ধেব্বব কামারের বো বললে—হ্যাঁ দিদি, নাকি আজকাল খেজুরের বাঁচি দিয়ে পান সাজা হচ্ছে সুপুঁরির বদলে ?

অনঙ্গ-বো বললে—সত্যি ?

কামার-বো বললে—সত্যি মিথ্যে জানি নে ঠাকরুণ-দিদি । মিথ্যে কথা বলে শেষকালে বামুনের কাছে, নরকে পচে মরবো ? কানে যা শুনচি—বললাম ।

কথা শেষে সে হাতের এক রকম ভাঙ্গি করে মৃদু হাসলো ।

এই টেকিশালের মজলিশে অনঙ্গ-বোয়ের পরে দেখতে ভালো হরি কাপালীর ছোট-বো, তার পরেই এই কামার-বো । এর বয়েস আরও কম ছোট-বোয়ের চেয়ে, রংও আরও একটু ফর্সা—তবে ছোট-বোয়ের মৃদুশ্রী এর চেয়ে ভালো । কামার-বো সম্বন্ধে গ্রামে একটু বদনাম আছে, সে অনেক ছেলে-ছোকরার মৃদু ঘুরিয়ে দেবার জন্যে দারী, অনেককে প্রণয়ও নেয় । কিন্তু ছোট-বো সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারে না । অনঙ্গ-বো বললে—পোড়া কপাল পান খাওয়ার । খেজুরের বাঁচি দিয়ে পান খেতে যাচ্চি নে ।

কিন্তু বাঁ কাপালী শুনেন হেসে খুন হয় আর কি । সে বিনোদ মোড়লের বিধবা বোন, ছাশিখ-সাতাশ বছর বয়স, আধফর্সা থান পরে এসেচে, দেখতে শুনতে নিতান্ত ভালও নয়, খুব মন্দও নয় । কথায় কথায় হেসে গাড়িয়ে পড়া ওর একটা রোগের মধ্যে গণা ।

অনঙ্গ-বোয়ের হাসি পেল কিন্তুরীর হাসি দেখে ।

হাসতে হাসতে বললে—নে বাপু খাম—তুই আবার জ্বালালি দেখাচি—এত হাসিও হোর !

ছোট-বো ঠোঁট উন্টে বললে—ওই বোঝো ।

ইতিমধ্যে বড়-বো কি ভাবে দুটো পান সেজে নিচু ঘরের দাওয়ার ধাপ থেকে নামলো ।

ছোট-বো বললে—বিনি সুপুঁরিতে দিদি ?

বড়-বো ঝঙ্কার দিয়ে বললে—ওরে না না । খুঁজে পেতে ঘর থেকে উটকে বার করলাম ।

—কোথায় ছিল ?

—তোকে বলবো কেন ?

—কেন ?

—তুই সম্বন্ধ উটকে বের করবি । তোর জ্বালায় ঘরে কিছু থাকবার জো আছে ? আঁমি যাই গিল্লী, তাই সব জিনিস যোগাড় করে তুলে লুঁকিয়ে রেখে দি । আর তুই সব উটকে উটকে বার করিস ।

ছোট-বো চোখ পার্কিয়ে ভূঁরু তুলে বললে—আঁমি ?

—হ্যাঁ, তুই । আঁমি কাউকে ভয় করে কথা বলবো নাকি ? তুই ছাড়া আর কে ?

—তুমি দেখেচি দাঁদি ?

—দেখি নি, একশো দিন দেখিছি। বর্ষা, ঘর বর্ষাতি দূ'খানা বাতাসা রেখে দিইছিলাম, ওমা সেদিন লেখ নেই সেটুকু। তুই চুরি করে খেয়েচিস। কে ঘরে ঢুকতে গিয়েচে তুই ছাড়া ? ছেলোপলের বালাই নেই যখন বাড়ীতে।

কথাটা বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়, কারণ এই কথা'র পর ছোট-বোয়ের কথা'র সূর ও তেজ কম গেল। সে বললে—খেইচি যাও, বেশ করিচি। আমার জিনিস না ?

—বড় যে সব দেখাচ্ছিস লা !

অনঙ্গ-বো বললে—আহা, কি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দূ'বেলা তোমাদের ঝগড়া। ধামো না বাপু।

বড়-বো বললে—আমি অন্য'র কথা'টি কি বলিচি বামুন-বো তুমিই বিচের কর। ঘর বলে জিনিস লুকিয়ে রাখি এই যজ্ঞের বাজারে। তুই সেগুলো উটকে উটকে চুরি করে খাস কেন ?

অনঙ্গ-বো বললে—ও ছেলমানুষ যে বড়-বো। তোমার মেয়ে হলে আজ অভ বড় মেয়েই হোত। হোত না ?

—আমার মেয়ের পোড়াকপাল !

—ওমা সে কি, পোড়াকপাল কি ! ছোট-বো দেখতে স্ত্রী কেমন ? চেয়ে দেখতে পাও না ? দূ'চোখের কি মাথা খেয়েচি !

ছোট-বো হঠাৎ বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। সে বললে—নাও নাও বামুন-বো, তোমার আদিখোতা দেখে আর বাঁচিনে !

বড়-বো ছোট-বোয়ের দিকে আড়চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মূখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অশ্রুত ভঙ্গিতে বললে—আহা-হা ! বর্ষা কত ঢং দেখালি লা !

কিন্দুরী কাপালী বড়-বোয়ের চোখ মূখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে পুনরায় হেসে গড়িয়ে প্রায় ঢেঁকির গড়ের উপর উপড়ে হয়ে পড়লো। মূখে অসংলগ্ন ভাবে যা বলতে লাগলো তা অনেকটা এই রকম—ওমা পোড়ানি—বড়-বো—হি হি—কি কাণ্ড—হি হি—বলে কিনা—ও বামুনদাঁদি—হি হি—আমি আর বাঁচবো না—ওমা—হি হি—ইত্যাদি।

কামার-বো বললে—তা নাও, তুমি আবার যে এক কাণ্ড বাধালে ! গড়ে কপাল ছেঁচে না যায় দেখো।

প্রবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ-বো যে এত আশাবাদী, সে পর্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ বেন কপূ'রের মত দেশ থেকে উবে গেল কোথায় ! এক দানা চাল কোথাও পাওয়া যায় না। অভ বড় গোবিন্দপূ'রের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে ষাচ্ছে চাল অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে। কুসুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতো বর্ষার বস্তার দেওয়ালের মত, সে গুলাম আজকাল শূ'নাগর্ভ। পথেঘাটে ক্রমশঃ ভিখারী'র ভিড় বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, এরা এতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এ দেশের লোকও নয় এরা, বিনেশী ভিখারী, একদিন অনঙ্গ-বো রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পচি-ছটি প্রব'উলঙ্গ স্রীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা—ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—ফ্যান খাইতাম—ফ্যান খাইতাম—



অনঙ্গ প্রথমটা ওদের উচ্চারণের বিকৃতির দরুন কথাটা কি বলা হচ্ছে বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া 'খাইতাম' এটা ক্রিয়াপদের অতীত কালের রূপ এসব দেশে, তা বর্তমানে প্রয়োগ করার সার্থকতা কি, এটা বুঝতেও একই দেরি হোল।

পরে বুঝলে যখন তখন বললে—একটু দাঁড়াও—ফ্যান দেবো।

ওরা হাঁড়ি, তোবড়ানো টিনের কোটো পেতে ফ্যান নিয়ে যখন চলে গেল, তখন অনঙ্গ-বো কতক্ষণ ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে নাকি যে দেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়েছে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এক মগ ফ্যান ভিক্ষে করতে? অনঙ্গ বোয়ের চোখে জল এল। নিজের ছেলেরা পাঠশালায় গিয়েচে, ওদের কথা মনে পড়লো। এতগুলো লোককে ভাত দেওয়ার উপযুক্ত চাল নেই ঘরে, নইলে দিত না হয় ওদের দুটো দুটো ভাত।

ক্রমে নানান্দান থেকে ভীর্ণিতহনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পঃওয়া যাচ্ছে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামের অমুক লোক আজ পাঁচদিন ভাত খায় নি—ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষে কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে? কখনই নয়। তাদের নিজেদের কোনো বিপদ নেই!

একদিন অনঙ্গ-বো খুব ভোরে ঘাটে গিয়ে দেখলে জেলেপাড়ার রয়ে জেলের বো ঘাটের ধারের কচুর ডাটা তুলে এক বোঝা বহরেচে।

অনঙ্গ হেসে বললে—কি গা রয়ের বো, আত্র বুঝি কচুর শাক খাবে?

জেলে-বো যেন ধরা পড়ে একটু চমকে গেল। যেন সে আশা করে নি এত ভোরে কেউ নদীর ঘাটে আসবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এ কাজ করছিল সে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পেলে ওর ধরনধারণে।

সে মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, মা।

—তা এত? এ যেন দু'দিন বেলায় শাক হবে।

—সবাই খাবে মা, তাই।

বলেই কেমন এক অশূভ ধরনে ওর মুখের দিকে চেয়ে জেলে-বো ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনঙ্গ-বো অবাক হয়ে বললে—ওকি রয়ের-বো, কাঁদাচিস্ কেন? কি হোল?

রয়ের-বো আঁচলে চোখের জল মুছে আস্তে আস্তে বলে—কিচ্চ কি সাধে মা? এই ভরসা।

—কি ভরসা?

—এই কচুর শাক মা। তিন দিন আজ কারো পেটে লক্ষ্মীর দানা সেধেই নি।

—বলিস কি রয়ের-বো? না খেয়ে—

—নির্নাক্য, মা নির্নাক্য—উতমার কাছে মিছে কথা বলবো না সকালবেলা। কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই শুক্কোর বাজারে। শুক্কোর আত্রা ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধরে বড় বড় কচুর ডাটা হয়েছে তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শধু শেধু।

অল্পকষ্টের এ মর্তিই কখনো দেখে নি অনঙ্গ। সে ভাবলে—আহা, জাহার ঘরে যদি চাল থাকতো! অত্র রয়ের-বো আর তার ছেলেমেয়েকে কি না খাইয়ে থাকি?

ছ বি. র. সুলভ ওয়—৪

জ্বলে-বো' আপন মনে বলতে লাগলো—এক সের দেড় সের নাছ ধরে। পয়সা বড় জ্বোর দশ আনা বারো আনা হয়। এক কাঠা চাল কিনতি একটা টাকা যায়—তাও মিলচে না হাটে বাজারে। হোরা গরীব নোক, কি করে ঢালাই বলো মা—

অনঙ্গ-বো আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেল। গঙ্গাচরণ ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে বসেছে। স্বামীকে বললে—হ্যাঁগা, এ কি রকম বাজার পড়লো চালের? ভাত বিনে কি সব উপোস দিতে হবে? আমাদের ঘরেও তো চাল বাড়ন্ত। আজকাল চালের ধান আর কেউ দেয় না। গাঁ থেকে ধান গেল কোথায়?

গঙ্গাচরণ বললে—তামার পয়সা ষেখানে গিয়েছে।

অনঙ্গ-বো রেগে-বললে—দ্যাখো ওসব রঙ্গরস ভাল লাগে না। একটা হিসেব করো—ছেলেপুলে উপোস করে থাকবে শেষে?

গঙ্গাচরণ চিন্তিত মুখে বললে—তাই ভাবচি! আমি কি চূপ করে বসে আছি গা? কি হবে এ ভাবনা আমারও হয়েছে।

—চারিধারের ব্যাপার দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে যে—আর বসে থেকো না। উপায় দ্যাখো। তিন দিনের মত চাল ঘরে আছে মজ্জুত—

—আর ধান কতটা আছে?

—সে ভান্লে বড় জ্বোর পাঁচ কাঠা চাল হবে। তাতে ধরো আরো দশদিন। তার পরে?

—আমিও তাই ভাবচি।

—মা হয় উপায় করো।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ পয়ঠালা বন্দ রেখে নরহরিপুরের হাটে গেল চালের সম্মানে। বিষ্টুপুর, ভাতছালা, শূরণপুর, খিড়ীঘি প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধানচাল জড়ো হয়ে আগে আগে নরহরিপুরের প্রসিদ্ধ চালের ও ধানের হাট বোঝাই হয়ে যেতো—সেই হাটের অত বড় চালা-ঘর খালি পড়ে আছে—এক কোণে বসে শূধু এক বুদ্ধী সামান্য কিছুর চাল বিক্রি করচে।

গঙ্গাচরণ কাছে গিয়ে বললে—কি ধানের চাল?

—কেলে ধান ঠাকুর মশায়। নেবেন? খুব ভালো চাল কেলে ধানের। কথায় বলে—  
ধানের মাধ্য কেলে, মানুষের মাধ্য ছেলে—

বুদ্ধীর কবিত্বের দিকে তত মনোযোগ না দিয়ে গঙ্গাচরণ ওর ধামা থেকে চাল তুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। যেমন মোটা, তেমনি গুমো। মানুষের অখাদ্য। তবুও চাল বটে, খেয়ে মানুষে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

—কতটা আছে?

—সবটা নেবা তুমি? তিন কাঠা আছে।

—দাম?

—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গাচরণ চমকে উঠলো, ভাবলে কথাটা সে শুনতে পায় নি। আবার জিজ্ঞেস করার পরেও যখন বুদ্ধী বললে এক কাঠার দাম দেড় টাকা, তখন গঙ্গাচরণের কপালে ঘাম দেখা দিলেছে। দেড় টাকায় আড়াই সের, তা হোলো পড়লো চাঁদ্র টাকা মণ। কি সর্বনাশ!

অনঙ্গ-বৌ এত দিন পরের বাড়ীর খান জেনে চাষিয়ে আসছিল বলে সে অনেকদিন হাটে বাজারের চালের দর জানে না। চাল এত চড়া গিয়েছে তা তো তার জানা ছিল না। চারিদিক অশংকার দেখলো গঙ্গাচরণ। এত বড় নরহরিপুরের হাট—খানচাল শুন্য। মানুষ এবার কি সত্যিই তবে না খেয়ে মরবে? কিসের কুলক্ষণ এনব? পরশুও তো চালের দাম এত ছিল না। দু'দিনে ষোল টাকা থেকে উঠলো চব্বিশ টাকা এক মণ চালের দর—তাও এই মোটা, গুমো, মানুষের অখাদ্য আউশ চালের!

গঙ্গাচরণের সারা শরীরটা ষেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। কি করে সে চালাবে? নিজস্বের খানের ক্ষেত নেই। চব্বিশ টাকা মণের চাল সে কিনে খাওয়াতে পারবে কদিন, বারো টাকা যার মাসিক আয়? অনঙ্গ-বৌ না খেয়ে মরবে? হাবু পটল না খেয়ে—না, আর সে ভাবতে পারে না।

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে দেখলে ধামা কাঠা হাতে আরও অনেক হাটের দিকে ছুটেছে চালের চেস্তায়। অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করে, চাল কেনে পালেন ও পিঁড়িত মশাই? কি দর?

—চব্বিশ টাকা।

—মোটা আশ চাল চব্বিশ? বলেন কি পিঁড়িত মশাই?

—দেখ গে যাও হাটে গিয়ে।

বৃন্দ দীনু নন্দী একটা ধামা হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটকে। দীনু নন্দী বাড়ীতে বসে সোনা-রুপোর কাজ করে অর্থাৎ গহনা গড়ে। সোনার কাজ তত বেশি নয়, চাষা-মহলে গহনার কাজে সোনার চেয়ে রুপোর ব্যবহারই বেশি। কিন্তু এই দু'দিনে গহনা কে গড়ায়, কাজেই দীনুর ব্যবসা অচল। দু'টি বিধবা ভাই-বো, বৃন্দা মাতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান, তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্য তার ঘড়ে। দীনু বললে—পিঁড়িত মশায়, চাল পাবো?

—ছুটে যাও। কড় ভিড়।

—হুঁটি বা কোথেকে, পারে বাত হয়ে কট পাচ্ছি বহু। দুবেলা খাওয়া হয় নি—

—বল কি?

—সত্যি বলছি পিঁড়িত মশাই। বামুন দেবতা, এই অবলায় কি মিছে কথা বলে নরক-গাম্ভী হবো?

দীনু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজ্জারে প্রস্থান করলে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরতে ফিরতেই কত লোক শূধু হুড়তই হাট থেকে ফিরছে দেখা গেল। সাগরতলার কর্মকারদের বাড়ীতে একই বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় দু'চার জন লোক সেখানে এসে জুটলো গল্প করতে।

একজন বললে—নরহরিপুরের হাটে চাল পাওয়া গেল না, আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন!

আর একজন বললে—লোকও জুড়ে হয়েছে দেখুন গে। এক কাঠা চাল নেই। কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন না খেয়ে আছে। আমারই বাড়ীতে দু'দিন ভাত খায় নি কেউ।

গঙ্গাচরণ বললে—আটা ময়দা নিয়ে যে যাবে, তাও নেই।

—বস্তাপড়া আটা আছে দু'এক দোকানে, বারো আনা সের। কে খাবে?

আবও মাইলখানেক এগিয়ে গেল গঙ্গাচরণ। ঝলসেঝলির সনাতন ঘোষ নিজের ঘরের

দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, ওকে দেখে বললে—পাঁড়ত মশাই, ওতে কি ? চাল নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন ?

—সে যা কষ্ট ভা আর বোলো না। এক বড়ীর কাছ থেকে সামান্য কিছু আশ্রয় করছি, তাও আগুন দর।

—কই দেখে দেখি ?

সনাতন ঘোষ নেমে এসে ওর হাতের পট্টলটা নিজের হাতে নিয়ে পট্টলি নিজেই খুলে চাল দেখতে লাগলো। ওর মূখটা যেন কেমন হয়ে গেল। চালের দানা পরীক্ষা করতে করতে বললে—বস্তু মোটা। কত দর নিলে ? একটা কথা বলবো পাঁড়ত মশাই ?

—কি ?

—দাম আমি যা হয় দিচ্ছি। আমায় অধেকটা চাল দিয়ে যান। দিতেই হবে। দু'দিন না খেয়ে আছে সবাই। মেয়েকে শব্দুর বাড়ীর থেকে এনে এখন মহা মর্শকিল, সে বেচারীর পেটে আচ্ছ দু'দিন লক্ষ্মীর দানা যায় নি—কত চেষ্টা করেও চাল পাই নি—

সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়, বাড়ীতে অনেকগুলো গরু, দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নরহরিপুরের ময়রাদের দোকানে যোগান দেয়—এই তার ব্যবসা। গঙ্গাচরণ ইতিপূর্বে সনাতনের বাড়ী থেকে দু-এক খুলি টাটকা ছানা নিয়েও গিয়েছে। তার আজ এই দশা ! কিন্তু চাল মাত্র সে নিয়েছে তিন কাঠা। আর কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এ চাল দিলে তার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকবে দু'দিন পরে। চাল দেওয়ার ইচ্ছে তার মোটেই নেই—এদিকে সনাতন মোক্ষম ধরেছে চালের পট্টলি, তার হাত থেকে চাল নিতান্তই ছিনিয়ে নিতে হয় তাহলে। কিংবা ঝগড়া করতে হয়।

সনাতন ততক্ষণে কাকে ডেকে বললে—ওরে একটা ধামা নিয়ে আয় তো বাড়ীর মধ্যে থেকে ? একটা কাঠাও নিয়ে আয়—

সনাতন নিজের হাতে এক কাঠা চাল যখন মেপে ঢেপে নিয়েছে, তখন গঙ্গাচরণ মিনতি-সূচক ভদ্রতার সুরে বললে—আর না সনাতন, আর নিও না—

—আর আধ কাঠা—

—না বাপু, আমি আর দিতে পারবো না। বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত—বুঝলে না ?

সনাতনের নার্তিটি বললে—দাদামশাই, ও'র চাল আর নিও না, দিয়ে দাও।

সনাতন মূখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো—তোদের জিন্য বাপু খেটে মরি, নিজের জিন্য কিসের ভাবনা। একটা পেট যে করে হোক চলে যাবেই। রইল পড়ে চাল, যা বৃষ্টিস করগে যা।

রাগ না লক্ষ্যী। গঙ্গাচরণ বিনা চক্ষুলাঙ্কায় সমস্ত চাল উঠিয়ে নিয়ে চলে এল। বাড়ী এসে দেখলে অনঙ্গ-বোঁ ভাত চাঁড়িয়ে ওল কুটতে বসেছে রামাঘরের দাওয়ায়। স্বামীকে দেখে বললে—ওগো শোনো, আমি এক কাজ করিচি। সেদিন সেই বোম্ব প্রভাতী সুরে গান করিছিল, মনে আছে ? আজ এসেছিল, কি সুন্দর গান যে গায় !

—কে বল তো ?

—সেই যে বলে—'উঠ গো উঠ নন্দারণী কত নিদ্রা যাও গো'—বেশ গজা—লম্বা মত, ফসাঁ মত বোম্বটি—

—ওর বাড়ী বেনাপোল। বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের পীঠ আছে, সেখানকার কাজ-কর্ম করতে। বেশ গায়।

—আমি তাকে বললাম রোজ সকালে এসে আমাদের বাড়ীতে ভগবানের নাম করবে। ভোরবেলায় বড় ভাল লাগে ভগবানের নাম। মাসে একটা টাকা আর এক কাঠা চাপের একটা সিধে দিতে হবে বললে, এই ধরো ডাল, নুন, বড়ি, দাঁড়ি আলু, বেগুন, একটু তেল—এই। আমি বলিচি দেবো। কাল থেকে গাইতে আসবে। হ্যাঁগা, রাগ করলে না তো শুনবে ?

—তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাঞ্জে ডাকে। দেবে কোথা থেকে ?

—তুমি ঝগড়া কোরে না। সকালে উঠে ভগবানের নাম শুনবে যে রোজ রোজ তখন ? হুঁ-হুঁ—আমি যেখান থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরীব বলে কি ভাল গান শুনতে নেই ?

পরদিন খুব ভোরে সেই বোস্টমটি সুস্বরে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে ওদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ খুশিতে ভরপূর হয়ে পাশের ঘরে এসে স্বামীকে ডেকে বললে—ওগো শুনচো ? কেমন গায় ? আর ভগবানের নাম—বেশ লাগে—না ?

গঙ্গাচরণ কিছু জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শূয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—আহা, ঢং দ্যাখো না ! ওগো গান শোনো—তাতে জাত যাবে না।

—আমি কি রাজা যে বন্দীরা প্রভাতী গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙবে ? তোমার পয়সা থাকে তুমি বন্দীদের মাইনে দিয়ে গোরানী। আমি ওর মধ্যে নেই।

—আম্মার বন্দীর গান যে শুনবে, তাকে পয়সা দিতে হবেই। তবে কানে আঙুল দাও—গঙ্গাচরণ হেসে কান চেপে ধরে বললে—এই দিলাম।

একটু বেলা হোলে অনঙ্গ-বৌ রান্না চড়ালে, তার পরে মনে মনে হিসেব করে দেখলে দিন দশ-বারো পরে চাল একেবারে ফুরিয়ে যাবে, তখন উপায় কি হবে ? চাল নাকি হাটে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই বলছে। তার স্বামী নির্বিরোধী মানুস, কোথা থেকে কি যোগাড় করবে এই দুর্দিনে ? ভাবলে মায়া হয়।

কাপালীদের ছোট-বোঁ চুপি চুপি এসে বললে—বামুন-দিদি, একটা কথা বলবো ? এক খাঁচি চাল ধার দিচ্ছি পারো ?

—মুশকিল করলি ছোট-বোঁ। তোদের চাল কি বাড়ন্ত !

—মোটো নেই। কাল ছোলা সেধ খেয়ে সব আছে। না হয় ছোট ছেলোটিকে দুটি ভাত দিও এখন দিদি। আমরা যা হয় করবো এখন।

অনঙ্গ-বৌ কি ভেবে বললে—একটু দাঁড়া। এসেচিস যখন তখন নিয়ে যা এক খাঁচি চাল। ওতে আমাদের কতদিনের সাশ্রয় বা হোঁত ?

কাপালী-বৌ চাল আঁচল পেতে নিয়ে বললে—এক জায়গায় কচুর শাক আছে তুলতে যাবে বামুন-দিদি ? গেরামে তো কচুর শাক নেই—যে যেখান থেকে পারচে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গাঙের ধারে এক জায়গায় সন্ধান করিচি, টের কচুর শাক হয়ে আছে। দু'জনে চলো চুপি চুপি তুলে আনি।

—চল, আজ দুপুরে যাবো। চাল তো নেই। যা দেখাচি ওই খেয়েই থাকতে হবে দু'দিন পরে।

সভা বেশিক্ষণ চললো না। বিশ্বাস মশায়ের কাছে যারা দরবার করতে এসেছিল, সবাই বদ্বলে এখানে ডাল গলানো শক্ত। যে যার বাড়ী চলে গেল।

গঙ্গাচরণ সুযোগ পেয়ে বললে—বিশ্বাস মশায়, আমি কি না খেয়ে মরবো ?

—কেন ?

—বাঙার চাল অমিল। আর দু'দিন পরে উপোস শুরু হবে। কি করি পরামর্শ দিন।

—আমার বাড়ী থেকে দু'কাঠা চাল নিয়ে যাবেন।

—তা দিয়ে ক'দিন চলবে বলুন।

—কেন ?

—আমার বাড়ীর পুঁথি দু'তিনজন। ও দু'কাঠা চাল নিয়ে ক'দিন খাবো ? আমার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করলে এই বিপদের দিনে আমি কোথায় যাই ? পাঠশালা চালাই কি খেয়ে ?

—আমার খানচাল থাকতো ভো বলতে পারা যেতো কিন্তু আমার নেই। আজ দু'কাঠা চাল নিয়ে যান, দাঁকু—

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে চলে গেল।

সে রাতে বিশ্বাস মশায় আহারাদির পর পুকুরপাড় থেকে গরু আনতে গিয়েছেন, কারণ সেখানেই তাঁর গোয়াল—এমন সময় দু'জন লোককে গাছের আড়ালে দেখে বলে উঠলেন—

—তোরা বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বিশ্বাস মশায়ের মাথায় সজ্জের এক লাঠি বাসিয়ে দিলে। এর পর ওরা তাঁকে পুকুরপাড়ের বাবলা গাছের সঙ্গে মোটা দড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। বিশ্বাস মশায়ের জ্ঞান রইল না বেশিক্ষণ, মাথায় যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে।

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই দেখলেন সূর্যের আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তাঁর বিধবা বড় মেয়ে তাঁর মূখের ওপর ঝুঁক পড়ে কাঁদছে।

বিশ্বাস মশায় বলে উঠলেন—ডাকাত ! ডাকাত !

বড় মেয়ে সৌদামিনী বললে—ভয় কি বাবা ? আমি—আমি যে—এই দ্যাখো।

বিশ্বাস মশায় ফ্যালফ্যাল চোখে সন্দেহ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে চূপ করে রইলেন।

সৌদামিনী বললে—বাবা কেমন আছ ?

বিশ্বাস মশায় এববার ডাইনে বাঁয়ে সতর্কতার সঙ্গে চেয়ে দেখে চূঁপ চূঁপ বললে—সব নিয়ে গিয়েছে ?

—কি বাবা ?

—সেই সব।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। সব ঠিক আছে।

—সেই যা আড়ায় তোলা আছে ? বস্তা ?

—কিছু নেয় নি।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখা মা—

সৌদামিনী বাপের মাথায় সশ্বেদে হাত বুলিয়ে বললেন—তুমি সেরে সেমলে ওঠো, আমি কি মিথো বর্নিচ তোমারে ? আড়ার ওপর যে বস্তা রেখিলে তা কেউ নেয় নি।

—তক্ষাপোশের তলায় যে বস্তা ছিল ?

—সব ঠিক আছে । নেবে কে ?

এই সময় গঙ্গাচরণ ঘরে ঢোকাতে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল ।

গঙ্গাচরণ পাশে বসে বললে—কেমন আছেন বিশ্বাস মশায় ?

—আছি এক রকম ।

গঙ্গাচরণ মূর্খস্বীয়ানা ভাবে বললে—হাতটা দেখি—

পরে বিজ্ঞের মত মূখ করে বিশ্বাস মশায়ের নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—হঁ—

সোদামিনী উৎকণ্টিত সুরে বললে—কি রকম দেখলেন পণ্ডিত মশাই ?

—ভালো । তবে কফের ধাত একটু প্রবল হয়েছে ।

সোদামিনী উৎকণ্টিত সুরে প্রশ্ন করলে—তাতে কি হয় ?

—হবে আর কি । তবে ব্যয় হয়েছে কিনা, কফের আধিক্য—

—ভাল করে বলুন ।

—মানে জিনিসটা ভাল না ।

বিশ্বাস মশায় স্বয়ং এবার মিনতির সুরে বললেন—আমাকে এবারটা চাক্ষু করে তুলুন পণ্ডিত মশাই । আপনি দশ সের চাল নিয়ে যাবেন ।

—থাক থাক, তার জন্যে কি হয়েছে ?

সোদামিনী কিন্তু ব্যক্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলো—না, আজই নিয়ে যাবেন'খন । ধামা আমি দেবো ।

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন নয় । সন্দের পরে । কেউ টের না পায় ।

গঙ্গাচরণ এ অণ্ডলে কবিরাজিও করে । কিন্তু কবিরাজি এখানে ভাল চলে না—কারণ এখানকার সবার 'সারকুমারী মত' । সে এক অশুভ চিকিৎসার প্রণালী । জ্বর ষত বেশিই হোক, তাতে শনানাহারের কোনো বাধা নেই । দু'চারজন সেরেও ওঠে, বেশির ভাগই মরে ! তবু ও-মতের লোক কখনো ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাবে না, মরে গেলেও না ।

গঙ্গাচরণ কথাটা জানে, তাই বললে—আপনার সেই সারকুমারী মতের ফকির আসবে নাকি :

—নাঃ । সেবার জলজ্যান্ত নাতিটাকে মেরে ফেললে । আমি ও-মতে আর নেই ।

—ঠিক তো ? দেখুন, তবে আমি চিকিৎসা করি মন নিয়ে ।

সোদামিনী বলে উঠলো—আপনি দেখুন ভালো করে । আমি ও-মতে আর কাউকে যেতে দেবো না এ বাড়ীতে । চাল নিয়ে যাবেন সন্দের পরে ।

দিন দুই পরে বিশ্বাস মশায় একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন । একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে বিশ্বাস মশায় বিছানায় উঠে বসে তামাক খাচ্ছেন । গঙ্গাচরণ শুনলে, এ গ্রাম থেকে বিশ্বাস মশায় উঠে যাচ্ছেন । জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে । বাইরে আট-শখানা গরুর গাড়ীর চাকার দাগ । রাত্রে এই গাড়ীগুলো যাতায়াত করেছে বলেই মনে হয় । গঙ্গাচরণ বৃদ্ধত প্যারলে বিশ্বাস মশায় মজুদ খান চাল সব সারিয়ে দিয়েছেন রাতারাতি ।

গঙ্গাচরণ বললে—কোথায় যাবেন চলে নিজের গা ছেড়ে ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—আপাতোক যাঁচি গঙ্গানন্দপুত্র, আমার স্বশুরবাড়ী। এ গাঁয়ে আর থাকবো না। এ ডাকাতির লেশ। সামান্য দুর্চার মগ ধান চাল কে না ঘরে রাখে বলুন তো পণ্ডিত মশায়। তার জনো মানুষ খুন? আজ ফস্কে গিয়েচে, কাল যে খুন করবে না তার ঠিক কি? না, এ দেশের খুরে নমস্কার বাবা।

—আপনার জমিজমা পুকুর এ সবের কি ব্যবস্থা হবে?

—আমার ভাগে দুর্গাপদ মাঝে মাঝে আসবে যাবে। সে দেখাশুনো করবে। আমি আর এমুখো হাঁচি নে কখনো। ঢের হয়েছে। ভাল কথা, একটা ভাল দিন দেখে দেবেন তো যাবার?

বুধবার সকালবেলা বিশ্বাস মশায় সত্যসত্যই জিনিসপত্র সমেত নতুন গাঁ কাপালী-পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন।

অনঙ্গ-বৌ শুনলে বললে—এই বিপদের দিনে তবুও এই একটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবু পাওয়া যেতো।। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দশা হবে। একদানা ধানচাল কারো ঘরে রইল না আর। ভস্মে পড়েই লোকটা চলে গেল।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

বেড়ায় বেড়ায় তিৎপাল্লার ফুল ফুটেচে। কোঁচ বকের লম্বা সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় এপার থেকে ওপারের দিকে।

অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েচে। ভূষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কানার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি করচে। অনঙ্গ-বৌকে দেখে সে যেন একটু সংকুচিত হয়ে গেল। যেন এ অবস্থায় কারো সংগ না দেখা হওয়াই ভালো ছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কেঁতুহলের সঙ্গে বললে—কি হচ্ছে গো গয়লা-দিদি?

ভূষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশী নয়, অনঙ্গ-বৌয়ের সমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলসলভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না তবে ওখানে কি হচ্ছে তোমার মরণ?

—এমনি।

—তবুও?

—নৃশনি শাক তুলচি—

বলেই হঠাৎ সলসল হাসি হেসে আঁচল রেখে বললে—মিথ্যে কথা বলবো না বান্দুর মেয়ের সামনে। এই দ্যাখো—

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—ও কি হবে? হাসি আছে বুঝি?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে একরশ কানামাথা গেঁড়ি-গুগলি। সে বললে—হাসি নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায়?

—এমনি! শাসি বের করে ঝাল-চর্চাড়ি হবে।

—সত্যি?

—অনেকে খায়, তুমি জানো না! আমরা শখ করে খাই ভাই।

—কি করে রাধে আমাকে বলে দিও তো?



—না ভাই। তুমি খেতে যাবে কি দঃখে ? তোমাকে বলে দেবো না।

সেদিনই একটু বেলা হোলে কাপালীদের ছোট-বোঁ এসে বললে—এক খাঁচি চাল ধার দিতি পারো ভাই ? বহু লঃজায় পড়িচি—

অনঃগ-বোঁ বললে—কি ভাই ?

—ভূষণ কাকার বোঁ এসেছে দুটো চাল নিতি। দু'দিন ভাত পেটে যায় নি। দুটো গৌড়ি-গুর্গলি তুলে এনেচে সেম্প করে খাবে। কিন্তু দুটো চাল নেই—আমার বাড়ী এসেচে—তা বলে, তুমি খাও জাঁড়ু জল, আমি খাই ঘাটে—

—আমারও চাল নেই ভাই।

—দুটো একটু হবে না ?

—আছে, দেবার মত নেই। তোর কাছে নুকুবো না। সের চারেক চাল আছে, তা থেকে দেবো না। তিন বেলার খোরাকও নেই।

কাপালী-বোঁ বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে টেনে টেনে বললে—তাই তো, কি হবে উপায় দিদি ? চাল তো কোথাও নেই। কি করি বল তো ?

অনঃগ-বোঁ বললে—ছিল বিশ্বেস মশায়, তার ঘরে যা হয় দুটো ধান চাল ছিল। সেও চলে গেল—

—আমরাও তো ভাই বলি—

—তবে কোন্ সাহসে চাল দেবো বের করে ?

—তা তো সত্যি কথাই।

হঠাৎ অনঃগ-বোঁ হেসে বললে—রাগ করলি ভাই ছোট-বোঁ ?

—না ভাই, এর মধ্যে রাগ কিসের ?

—অঁচল পাত। চাল নিয়ে যা—

—তোমাদের ?

—যা হয় হবে। তবু থাকতে দেবো না তা কি হয় ? নিয়ে যা—

দিন কতক পরে চালের ঘোর অনটন নোকের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে ? অনঃগ-বোঁ দু'দিন ছেলেদের মধ্যে ভাত দিতে পারলে না, শুধু সজনে শাক সেম্প। একদিন এসে কাপালী-বোঁ দুটো সুঁষনি শাক দিয়ে গেল, একদিন গঙ্গাচরণ কোথা থেকে একম্বান, খোড় নিয়ে এল। জাতের ফ্যান চেয়ে ঘরে ঘরে ফিরচে ত্রিপুড়া জেলা থেকে আগত মেয়েপুরুষ। গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

সম্ভার দিকে রামলাল কাপালী এসে গঙ্গাচরণকে চূঁপ চূঁপ বললে—পাঁ'ভত মশায় চাল নেবেন ? গঙ্গাচরণ বিশ্বয়ের সুরে বললে—কোথায় ?

—মেটেরা বাজতপুর থেকে আমার শ্বশুর এক বস্তা চাল নিয়ে লুটকিয়ে পালিয়ে এসেছেন আমার বাড়ী। দেড় মণ চাল, বোনামুর্ডি ধানের ভাল চাল। ছোট-বোঁ বললে—বামুনদিদির বাড়ী বলে এসো।

—কি দর ?

—শ্বশুর বলছেন চাঁদ্রশ টাকা করে মণ—

—আউশ চালের মণ চল্লিশ টাকা ?

—তাই মিলচে না দাদাঠাকুর । আপনি তো সব জানো ।

গঙ্গাচরণ ইতস্ততঃ করতে লাগলো । দু'গাছা পাতলা রুঁলি আছে অনঙ্গ-বোয়ের হাতে । একবার গেলে আর হবে না ।

কিস্তু উপায় কি ? ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ? বাড়ীতে এসে শ্রীর কাছে বলতেই তখনি সে ঝলে দিলে । এক মণ চালই এসে ঘরে উঠলো ।

রামলাল কাপালী বলে দিলে—চুঁপি চুঁপি নিয়ে যাবেন দাদাঠাকুর ।

সন্ধ্যার অনেক পরে চাল নিয়ে আসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ ও তার দুই ছেলে পড়ে গেল নিমাই জেলের সামনে । সে নদীতে যাচ্ছে আলোর মাছ ধরতে । ওদের দেখে বললে—কে ? গঙ্গাচরণ বললে—এই আমরা ।

—কে পিঁড়িত মশাই ? পেন্নাম হই । কি ওতে ?

—ও আছে ।

—বান বৃষ্টি—পিঁড়িত মশাই ?

—হাঁ ।

নিমাই জেলের বিধবা মেয়ে পরদিন ভোর না হতে এসে হাজির । না খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা, দুটো ধান দিতে হবে । অনঙ্গ-বোঁ মিথ্যে কথা বলতে তেমন পারে না, না ভেবেই বলে বসলো—ধান তো নেই ঘরে, চাল এনেছিলেন কিনে উনি ।

—তাই দুটো দ্যান বামন-দিদি, না খেয়ে মরাচি ।

দিতে হোল । ঘরে থাকলে না নিয়ে পারা যায় না । ফলে দলে দলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক আসতে লাগলো । কেউ ভাত দাও, কেউ চাল দাও দুটি । এক মণ চাল দশ দিনে উঠে গেল, মাঝে পড়ে অনঙ্গ-বোয়ের শেষ নম্বল রুঁলি দু'গাছা অনন্তের পথে যাত্রা করলো ।

ইতিমধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতি মর্দাচিনী এসে হাজির ।

অনঙ্গ-বোঁ বললে—কি রে মতি ? আয় আয়—

মতি গলায় অঁচল দিরে দূর থেকে প্রণাম করে বললে—গড় করি দিদি-ঠাকরুণ ।

—কি রকম আঁছস ? এ রকম বিঁচ্চারি রোগা কেন ?

—ভালো না দিদি-ঠাকরুণ । না খেয়ে খেয়ে এমনি দশ্য ।

—তোদের ওখানেও মশ্বস্তর ?

—বলেন কি দিদি-ঠাকরুণ, অত বড় মর্দাচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই । সব পালিয়েছে ।

—কোথায় ?

—ও দিকি দু' চোক যায় । দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাত খাই নি, শব্দ চুনো মাছ ধরভান আর গেঁড়ি-গুর্গাল । তাও এমনি মেলে না । ভাতছালার সেই বিঁলর জল ঘোল-দই । শব্দ ব্যাখা মর্দাচিপাড়া, বাগদিপাড়ার গোয়ে-ছেলে বোঁ-বোঁ সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুর্গাল ধরচে । সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল । আর আধ পোয়া মাছও হয় না । ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে, ওদের না কাঁচা গেঁড়ি-গুর্গাল তুলে ওদের মূখে দিয়ে কামা খামিয়ে এসে আবার জলে নেমেছে । কত মরে গেল ওই সব খেয়ে । নেতু বুনোর ছোট মেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে ।

—বলিস কি মতি ?

—আর বলবো কি । অত বড় মূঁচপাড়া ভেঙে গিয়েচে দাঁদ-ঠাকরূপ ।

—কেন ?

—কে কোথায় চলে গেল ! না খেয়ে কদিন থাকা যায় বলুন ? যার চোক যোনিকে যায় বেরিয়ে পড়েচে । আমার ভাই দুটো, অমন জোরান ভাইপো দুটো না খেয়ে খেয়ে এমনি খ্যাংরা কাটি—তারপর কোন দাঁকি যে তারা চলে গেল তা জানি নে । আহা, অমন জোরান দুই ভাইপো !—আর এই দ্যাখো আমার শরীল—

হাত দুটো বের করে দাঁখিয়ে মতি মূঁচনী হাউ-হাউ করে কে'নে উঠলো ।

অনঙ্গ-বো তাদ্রাতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে—কাঁদিস নে মতি । জল খা, একটু গুড় দি । ভাত দেবো । কাঁদিস খাস নি ?

মতি দু'হাতের আঙুল ফাঁক করে বললে—সাত দিন ।

শেষ পর্যন্ত মতি মূঁচনীর অবস্থা অনঙ্গ-বোয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলে ।

না খেয়েও তাহলে মানুষ কষ্ট পায়, নয়তো ভাতছানার অতগুলো মূঁচির অবস্থা আজ এরকম হোল কি করে ?

এই অনময়ে আবার একদিন এসে পড়লো কামসেবপুত্রের দুর্গা পান্ডিত ।

সেদিন অনঙ্গ-বো দুটো সূর্যনি শাক তুলে এনেচে নোনাতলার জোল থেকে, সে যেন এক পরম প্রাণি । খুব বেলা গেলে কাপালীদের ছোট-বো সেদিন ডাকলে—ও বামুন-দাঁদ, চলো এক জায়গায়—

—কোথায় রে ছুটাক ?

—নোনাতলার জোলে—

—কেন রে, এত বেলা গেলে নোনাতলার জোলে ? ভোর নাগর বৃষ্টি নুঁকিয়ে ভোর সপ্তে দেখা করবে ?

—আ মরণ বামুন-দাঁদর । সোয়ামী আছে না আমার ? অমন বৃষ্টি বর্ষাতি আছে সোয়ামী যাদের আছে তাদের ? তোমরা রূপসী-বো, তোমাদের নাগর থাকুক, আমার দাঁকি কে ভাকাবে তোমরা থাকতি ? তা না গো—সূর্যনি শাক হয়েছে অনেক, নুঁকিয়ে তুলে আনি চলে । কেউ এখনো টের পায় নি । টের পেলে আর থাকবে না ।

নোনাতলার জোল গ্রামের পেছন দিকের বাঁশবন আমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গা । বর্ষাকালে নিচু জায়গাতে জল বাধে—এখন জল নেই—শরতের শেষে দলাশয় শুকিয়ে উঠে । ভিজ়ে মাটির ওপর নতুন সূর্যনি শাক একরাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বোয়ের মধ্যে হাসি ধরে না । বললে—এ যে ভাই অনেক ।

কাপালী-বো হাসতে হাসতে বললে—একেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো !

—তা হোক, কারো চুরি তো করিচি নে ।

—ভগমানের জিনিস হয়ে আছে, তুলে খাও । এখনো কেউ টের পাই নি তাই রক্ষ । নইলে ভেসে যেতো সব এতদিন ।

অনঙ্গ-বো আবার ভীতু মেয়ে, একটা শেয়াল ঝোপের দিকে খসখস করতেই চমকে উঠে বলে উঠলো—কি রে কাপালী-বো, বাঘ না তো ?

—বাঘ না তোমার মূঁচু বামুন-দাঁদ । দ্যাখো না চেয়ে—

—তুই কি করে এ বনলা ভ্রামগায় শাকের সম্বন্ধান পেলি ? সত্যি কথা বল ছুটুকি—  
অনঙ্গ-বো কাপালীদেব ছোট-বউয়ের স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু কিছু না জানতো এমন  
নয় । গোড়া থেকেই ওর মনে সম্ভেই না হয়োছিল এমন নয় ।

কাপালী-বো হাসতে হাসতে বললে—দুঃ—

—আবার ঢাকাছস ? এখানে তুই কি করে এলি রে ? কখন এলি ? এখানে মানুষ  
আসে ?

—এ্যালাম ।

—কেন এলি ?

কাপালী-বোয়ের মূখ সলঙ্গ হয়ে উঠলো । বললে—এমনি ।

—মিথ্যে কথা । এমনি নয় । বলি, হ্যারে ছুটুকি, তোর ও স্বভাব গেল না ? ভারি  
খারাপ ওসব, জানিস ? স্বামীকে ঠিকিয়ে ওসব এখনো করতে তোর মন সরে ? ছিঃ—

কাপালী-বো চুপ করে রইল । অন্য কেউ এমন কথা বললে সে রেগে ঝগড়া-ঝাঁটি  
করতো, কিন্তু অনঙ্গ-বোয়ের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কারো সাধ্য হয় না তার মূখের  
ওপর কথা কইতে । বিশেষ করে যখন সে একটা এমন ধরনের ব্যাপারের প্রতিবাদ করতে ।

অনঙ্গ-বো বললে—না সত্যি ছুটুকি, তুই রাগ করিস নে । আমি ঠিক কথা তোরে  
বলচি—

কাপালী-বো ঝাঁক মেঝে মূখ ওপরের দিকে ফুটন্ত ফুলের মত তুলে বললে—আমি কি  
আসতে চাই ? আমাকে ছাড়ে না যে—

—কৈ ?

—নাম নাই বললাম বউ-দিদি ?

—বেশ যাক্ সে । না ছাড়লেই তুই অর্শন আসবি ?

—আমার চাল যোগাড় করে এনে দেয় । সত্যি, বউ-দিদি তুমি সতী নক্ষত্রী ভাগ্যমানী  
—মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে, বামুন দেবতা । সোঁদিন আমি না খেয়ে উপোস করে  
আর পারি নে । খিদে সইতে পারি নে ছেলেবেলা থেকে । বাপ মা থাকতি, সকাল  
সকাল এক পাথর পাশ ভাত দুটো কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বেড়ে দিত । খেতাম পেট ভরে ।

—তার পর বল্—

—সোঁদিন উপোস করে আছি সারাদিন, ও এসে বললে—

এই পর্যন্ত বলে কাপালী-বো লজ্জায় মূখ নিচু করে বললে—না, সে কথা আর—

—কি বললে ?

—চাল দেবো আধ কাঠা ।

—তাইতে তুই—

এই পর্যন্ত বলেই অনঙ্গ-বো চুপ করে গেল । ওর কাছে এসে ওর হাত ধরে গম্ভীর সুরে  
বললে—ছুটুকি ?

কাপালী-বো চুপ করে রইল ।

—তুই আমার কাছে গেলি নে কেন ?

—তুমি সোঁদিনও আমার সঙ্গে শাক তুলে নিয়ে গেছিলে । তোমার কাছে কিছু ছিল না  
সোঁদিন ।

—যেদিন মতি মর্চিনী এল ভাতছালা থেকে ?

—হঁ।

অনঙ্গ-বোয়ের চোখ ছলছল করে এল। সে আর কিছু না বলে কাপালী-বোয়ের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

দুর্গা পিঁড়িত এসে আড় হয়ে শূন্যে পড়েছিল ওদের দাওয়ায়। বাড়ীতে কেউ ছিল না, গঙ্গাচরণ পাঠশালায়, ছেলেরা কোথায় বেরিয়েছিল। অনঙ্গ-বো শাক তুলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে প্রদান গনলো। আজই দিন বুকে! শূন্য এই শাক ভরসা, দুটো কটা মোটা নাগরা চাল কোথা থেকে উঁন ওবেলা এনেছিলেন, তাতে একজনেরও পেট ভরবে না।

দুর্গা পিঁড়িত বললেন—এসো মা। তোমার বাড়ী এলাম।

—বসুন, বসুন।

—তোমাদের সব ভালো ?

—এক রকম ওই।

আধঘণ্টা পরে দুর্গা পিঁড়িত হাত-পা ধুয়ে সূক্ষ্ম ঠাণ্ডা হয়ে অনঙ্গ-বোয়ের কাছে তাঁর দুঃখের বিবরণ দিতে বসলেন। যেন অনঙ্গ-বো তাঁর বহুদিনের আপনার জন।

অনঙ্গ বললে—তিন দিন খান নি? বলেন কি?

—আমিই তো নয়, বাড়ীসূক্ষ্ম কেউ নয় মা। বলি না খাওয়ার কষ্ট আর সহ্য হয় না, আমার মায়ের কাছে যাই।

—তা এলেন ভালই করেছেন।

অনঙ্গ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো আপাতোক বুড়োকে কি দিয়ে একটু জল দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দুটো চা পড়ে আছে হাড়ির মধ্যে পর্দুলিতে। বললে—একটু চা করে দেবো?

দুর্গা পিঁড়িত খুশির সঙ্গে বলে উঠলো—আহা, তা হোলে তো খুবই ভালো হোল। কর্তদিন চা পেতে পড়ে নি।

অনঙ্গ-বো চিন্তিত মুখে বললে—কিন্তু নুন-চা খেতে হবে। দুধ নেই।

—তাই দাও মা। লবণ-চা আমি বড্ড ভালবাসি।

শূন্য একবারিট নুন-চা। তা ছাড়া অনঙ্গ-বোয়ের কিছু দেবার উপায়ও ছিল কি?

রাত্রে গঙ্গাচরণ এসে দুর্গা পিঁড়িতকে দেখে মনে মনে তাঁর চটে গেল। শূন্যকে বললে—জুটেছে ওটা আবার এসে?

অনঙ্গ-বো রাগের সুরে বললে—জুটেছে। তা কি হবে এখন?

—তলে যেতে বলতে পারলে না? কি খেতে দেবে শূন্য?

—তুমি আমি দেবার মালিক? যিনি দেবার তিনিই দেবেন।

—হ্যাঁ তিনি তো দিলেন দুবেলা। তাহোলে ওকেও তো তিনি দিলেই পারতেন। তোমার বন্ধে নিয়ে এসে চাপালেন কেন?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই তাঁর নামে। তিনি ঠিক জোটাবেন। এখানে যিনি পাঠিয়েছেন, এও তাঁর কাজ। যোগাবেন তিনি।

—বেশ, যোগান হবে। দেখি বসে বসে।

—নাও, হাত-পা ধুয়ে—এখন নুন-চা খাবে একটু ?

দুর্গা পান্ডিত বেশ শেকড় গেড়ে বসে গেল সেদিন থেকে, মনে হোল গঙ্গাচরণের। মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গাচরণ মূখে কিছু বলতে পারে না। দেখতে দেখতে তিন দিন দিবা কাটিয়ে দিলে। অনঙ্গ-বোয়ের আশ্রিত জীব, কোথা থেকে এনে যে ওকে অনঙ্গ-বো খাওয়ায়, কেউ বলতে পারে না।

সেদিন দুর্গা পান্ডিতকে বসে সামনের বেড়া বাঁধতে দেখে গঙ্গাচরণ বিরক্ত হয়ে বললে—  
ও কাজ করতে আপনাকে কে বলেচে ?

দুর্গা পান্ডিত খতমত খেয়ে বললে—বসে বসে থাকি, বেড়াটা বাঁধি ভাবলাম।

—না, ও রাখুন। ও আপনাকে করতে হবে না। হাবু বাঁধবে এখন।

—ও ছেলেমানুষ, ও কি পারবে ?

—খুব ভাল পারে। আপনার হাতে এখনি দায়ের কোপ লেগে যাবে। এখন ও রাখুন।

দুর্গা পান্ডিত একটু কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। সংসারের এটা-ওটা করবার চেষ্টা করে, তাতে গঙ্গাচরণ আরও চটে যায়। এর মতলবখানা কি, তাহলে এখানেই থেকে যেতে চার নাকি ? অনঙ্গ-বো দিবা ওকে চা খাওয়াচ্ছে, খাবার যে না খাওয়াচ্ছে এমন নয়। শ্রীকে কিছু বলতেও সাহস করে না গঙ্গাচরণ।

চালের অবস্থা ভীষণ। এর ওর মূখে শুধু শোনা যাচ্ছে চাল কোথাও নেই। একদিন সাধু কাপালী সন্ধান দিলে, কুলেখালিতে এক গোয়ালার বাড়ীতে কিছু চাল বিক্রি আছে। কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। তবুও গরজ বড় বালাই, সাধু কাপালী ও সে দুজনে সাত ক্রোশ হেঁটে কুলেখালি গ্রামে উপস্থিত হোল। এদিকে রেল-টেল নেই, বড় বাজার গল্প নেই—চাল থাকতেও পারে বিশ্বাস হোল গঙ্গাচরণের !

ঝঞ্জে ঝঞ্জে সেই গোয়ালার-বাড়ী বারও হোল। ব্রাহ্মণ দেখে গৃহস্বামী ওকে যত্ন করে বসাল, তামাক সেজে নিয়ে এল।

গঙ্গাচরণ বললে—জয়গাটা তোমাদের বেশ।

আসল কথা কিছু বলতে সাহস করচে না, বুক টিপ টিপ করচে। কি বলে বসে কি জানি ! চাল না পেলে উপোস শুরুর হবে, নবসুন্দু।

গৃহস্বামী বললে—অজ্ঞে হা। তবে ম্যালেরিয়া খুব।

—সে সর্বত্র।

—আপনাদের ওখানেও আছে ? নতুন গায়ে বাড়ী আপনার ? সে তো নর্দার ধারে।

—তা আছে বটে, তবু ম্যালেরিয়াও আছে।

—এদিকে যাঁজ্বলেন কোথায় ?

—তোমার এখানেই আসা।

—আমার এখানেই ? সে আমার ভাগ্যা। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়লো। তা কি মনে করে ?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো ?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর। আমাদের কাছে ও কথা বলতে নেই। বলুন কি জন্যে আসা ?

—তোমার বাড়ী চাল আছে স্বন্দন পেয়ে এসেচি। দিতেই হবে কিছ্। না খেয়ে মরচি একেবারে।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ গম্ হয়ে থেকে বললে—আপনাকে বলচে কে ?

—আমাদের গ্রামেই শূনেচি।

—বাবাঠাকুর, চাল আমার আছে, নিথো কথা বলবো না। আপনি দেবতা। কিন্তু সে চাল বিক্রি করবার নয়।

—কত আছে বলবে—

—তিন মণ। নদীকূলে রেখেছিলাম, বেদিন গবর্ণমেন্টের লোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন গাটর মধ্যে পদে রেখেছিলাম বলে চালগুনো একটু গুনো গম্ হয়ে গিয়েচে। ধান নেই, শূধু ওই চাল কটা সম্বল। ও বিক্রি করলি—আমরা কাচা বাচ্চা নিয়ে ঘর কার, রাগ করবেন না, অভিন্দ্রপাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতি পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার তার কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত নিয়ে বলচি।

চাল পাওয়া গেল না। ফিরে আসবার পথে গঙ্গাচরণ চোখে অশ্রুকার দেখলে। সাধু কাপালীও সঙ্গে ছিল ওর। ক্রোশ দুই এসে ওদের বড় খিদে ও জলতেমটা পেলে। সাধু বললে—পশ্চিম মশাই, আর তো হাঁটা যায় না।

—তাই তো দেখাছ, কাছে কি গাঁ ?

—ডলুন যাই, বামুনভাঙা-শেরপুর সামনে, তার পরে ঝিকরহাটি।

বামুনভাঙা-শেরপুর গ্রামে ঢুকেই ওরা একটা বড় আটচালা ঘর দেখতে পেলে। সাধু কাপালী বললে—ডলুন এখানে। ওরা একটু জল তো দেবে।

গৃহস্বামী জাতিতে সদগোপ, ওদের যত করে কসালে; গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতে দিলে। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা অখের গুড় নিয়ে এল, জল নিয়ে এল। বললে—এবেলা এখানে দুটো রসুই করে খেয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হয়ে বললে—রসুই ?

—হাঁ বাবাঠাকুর। তবে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ আরও আশ্চর্য হয়ে বললে—তবে ?

—বাবাঠাকুর চাল তো অনেকদিনই নেই গায়ে। দিন দশেক থেকে কেউ ভাতের ম্খ দেখে নি এখানে।

—তবে কি রসুই করবো ?

—বাবাঠাকুর কলতে লক্ষ্য করে, কলাই-সেম্ খেয়ে সব দিন-গুজরান করচে। বড়-ছোট সবাই। আপনাকেও তাই দেবো। আর লাউ-ডাটা চচ্চাড়ি। ভাতের বদলে আজকাল সবাই ওই খাচ্চ এ গায়ে।

সাধু কাপালী তাতেই রাজী। সে বেচারী দুদিন ভাত খায় নি—ওর ম্খের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণ বললে—বাপু যা আছে বের করে দাও।

সেম্ কলাই নুন আর লক্ষা, তার সঙ্গে বেগুনপোড়া। সাধু কাপালী খেয়ে উঠে বললে—উঃ, এতও অনেকটাই ছিল পশ্চিম মশাই।

গঙ্গাচরণ বললে—একটা হিন্দু পাওয়া গেল, এ জানতাম না সত্যি বলছি। কিন্তু এ খেয়ে পেটে সহবে কদিন তাই ভাবচি।

সম্ভার দিকে শূন্য হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরলো, কেবল সাধু কাপালী গোটাকতক বেগুন নিয়েচে। সাধু গরীব লোক নয়, তাঁর-তরকারি বেচে সে হাটে হাটে তিন-চার টাকা উপার্জন করে, কিন্তু টাকা দিয়েও চাল মিলচে কোথায় ?

দুর্গা, অনঙ্গ-বো ও ছেলেদের কারো খাওয়া হয় নি। ওদের মূখ দেখে বৃষ্ণতে পারলে গঙ্গাচরণ। ও নিজে তবুও যা হোক দুটো কলাই সেশ্বও খেয়েছে। অনঙ্গ-বো স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে চালের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না। গঙ্গাচরণ হাত-পা ধুয়ে বসলে চা করে ও নিয়ে এল। দুর্গা নিজেও আজ চালের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। কোথাও সম্ভান মেলে নি। অনঙ্গ-বো ওকে বললে—খাবে এখন ? গঙ্গাচরণ কোঁতুলের সঙ্গে খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলে খালার একপাশে শূন্য তরকারী, ভাত নেই—খানিকটা বেশি করে মিষ্টি কুমড়া সেশ্ব, একটু আখের গুড়। স্ত্রী যেন অন্নপূর্ণা, এও তো কোথা থেকে জোটাতে হয়েছে ওকেই !

গঙ্গাচরণ কিছু ঠিক করতে পারে না ভেবে ভেবে। রোজ রোজ এই খেয়ে মানুষ কি বাচে !

স্ত্রীকে বললে—আর এক খাবার দেখে এলুম বামুনডাঙা-শেরপুরে। সেখানে সবাই কলাই সেশ্ব খাচ্ছে।—খাবে এক দিন ?

অনঙ্গ-বোয়ের দিকে চেয়ে ওর মনে হোল এই কদিনে ও রোগা হয়ে পড়ছে। বোধ হয় পেট পুরে খেতে পায় না নিজে, আর ওই বড়োটা এসে এই সময় স্কস্কসে চপে আছে। বড়োকে খাওয়াতে গিয়ে ওর নিজের পেটে কিছু যাচ্ছে না হয় তো। নাঃ, এমন বিপদেও পড়া গিয়েছে !

অনঙ্গ-বো কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে কে বলে উঠলো—ও বামুন-দিদি—

অনঙ্গ-বো বাইরে এসে দেখলে ভাতছালার মতি-মুচিনী উঠানে দাঁড়িয়ে। শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে উলি-দুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে।

ওকে দেখে মতি হাসতে গেল। কিন্তু শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য গেল নষ্ট হয়ে। সব প্রথমে অনঙ্গ-বো প্রশ্ন করলে—কে মতি ! খাস্ নি কিছু ? আয়—বোস।

তারপর দু'মিনিটের মধ্যে দেখা গেল টেমি জেরলে উঠানে একখানা কলার পাত পেতে মতিকে বসিয়ে দিয়ে অনঙ্গ-বো ওকে খেতে দিয়েছে, সেই মিঠে কুমড়া সেশ্ব আর লাউশাক চর্চাড়। মতি বললে—দুটো ভাত নেই বামুন-দিদি ? অনঙ্গ-বো দৃষ্টিত হোল।

মতি মুচিনীর মুখে নিরাশার চিহ্ন। ভাত দিতে পারলে না ওর পাতে অনঙ্গ-বো। একদানা চাল নেই ঘরে কদিন। এই সব খেয়ে চলচে সবাই। তাও যে মেলে না। লাউশাক আর কুমড়া কত কষ্টে যোগাড় করা।

অনঙ্গ-বো আদর করে বললে—আর কি নিবি মতি ?

মতি হেসে বললে—মাছ দ্যাও, মূগির ডাল দ্যাও, বড়ি-চচ্চড়ি দ্যাও—

—দেবো, তুই খা খা—হ্যারে ভাত পাস্ নি কদিন রে ?

মতি চোখ নীচু করে বলার পাতার দিকে চেয়ে বললে—পনেরো-ষোল দিন আজ সেশ্ব কচু সেশ্ব আর পুইশাক সেশ্ব খেয়ে আছি। আর পারি নে বামুন-দিদি। তাই জোটাতে

ছ. বি. র. সুলভ ওয়—৫



পাচ্ছ নে। ভাবলাম আর তো মরেই যাবো, মরবার আগে বামুন-দিদির বাড়ীতে দুটো ভাত খেয়ে আসি।

অনঙ্গ-বো চোখের জল মুছে দৃষ্টকণ্ঠে বললে—মতি, তুই থাক আঙ্ক। ভাত তোকে আমি কাল খাওয়াবোই। যেমন করে পারি।

মতি মূর্চনাকে দুদিন অস্তর যাহোক দুটি ভাত দেয় অনঙ্গ-বো।

কোথা থেকে সে ভাত যোগাড় হয়, তা তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে না। দুর্গা বৃদ্ধে বাড়ী গিয়েছে কামদেবপুরে, কিন্তু গাঙ্গাচরণের দৃঢ়বাস, ও ঠিক আবার এসে জুটেবে। এ বাজারে এমন নির্ভাবনায় আহার জুটেবে কোথা থেকে ?

সোদিন মতি দুপুরে এসে হাজির। ওর পরনে শর্তাঙ্কস কাপড়, মাথায় তেল নেই। অনঙ্গ-বো ওকে বললে—মতি তেল দিচ্ছ, একটা ভূব নিয়ে আয় দিকি !

—পেট জ্বলছে বামুন-দিদি। কাল ভাত জোটে নি, নেয়ে এলেই পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

—তুই যা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

মতি মূর্চনাকে নিৰ্বোধ মেয়ে নয়, সে চূপ করে থেকে বললে—না, তোমাদের এখানে আর থাকো না।

—কেন রে ?

—তুমি পাবে কোথায় বামুন-দিদি যে রোজ রোজ সেবে ?

—সে ভাবনা তোর নয়, আমার। তুই যা দিকি, নেয়ে আয়—

মতি মূর্চনাকে স্নান সেরে এল। একটা কলার পাতে আধপোয়াটাক কলাইসিঁথ ও কিসের চর্চাড়ি। অনঙ্গ-বো ধরা গলায় বললে—ওই যা মতি।

মতি অবাধ হলে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে বললে—তোমাদেরও এই শুরু হয়েছে ?

—তা হয়েছে।

—চাল পেলে না ?

—পঞ্চাশ টাকা মণ। দাম দিলে এখনি মেলে হয়তো।

—কিন্তু এ তোমরা খেয়ো না বামুন-দিদি।

—কেন রে ?

—এ কি তোমাদের পেটে সহ্য হয় ? আমাদের তাই সহ্য হয় না।

—তুই যা যা—এত বক্তমে দিতে হবে না তোকে।

বিকলে মতি এনে বললে—বামুন-দিদি, এক জায়গায় মেটে আলু আর বুনো শোলা কচু-হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। একটা শাবলচাঁবল দ্যাও, কেউ এখনো টের পায় নি, তুলে আনি।

অনঙ্গ-বো বললে—তুই একলা পুরািবি আলু তুলতে ?

—কেন পারবো না ? দ্যাও একখানা শাবল—

—খাস নি, দুর্বল শরীর, ভরমি লেগে পড়ে যাবি। তুই আর আমি যাই—

এই সময় কাপালীদের ছোট-বো এসে জুটলো। বললে—কি পরামর্শ হচ্ছে তোমাদের গা ? অতএব ছোট-বোকেও ওদের সঙ্গে নিতে হোল।

গ্রামের উত্তর মাঠের নিচেই সবাইপুরের বাঁড়। বাঁড়ের ধারে খুব জঙ্গল। জঙ্গলের

মধ্যে একটা শিমূলগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! বাঁড়াগাছের দর্ভেঁদ্য ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ওরা এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু অনঙ্গ-বৌ আর কাপড় ছাড়তে পারে না। কি বিলী কাটা।

মতি মর্চিনী বিরক্ত হয়ে বললে—তুর্নি বললাম তুমি এসো না। এখানে আসা কি তোমার কাজ? কক্ষনো কি এসব অভোস আছে তোমার? সরো দেখি—

মতি এসে কাটা ছাড়িয়ে দিলে।

অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—ছাঁলি তো এই সম্মেবেলা?

মতি হেসে বললে—নেয়ে মরো এখন বামুন-দিদি।

—যা যা, আর মজা দেখতে হবে না তোমার—টের হয়েছে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। মস্ত বড় মেটে আলু লতার গোড়া খঁড়ে সের পাঁচ-ছয় ওজনের বড় আলুটা তুলতে ওরা সবাই মেখে নেয়ে উঠেছে। মতি মর্চিনী মাটি মেখে ভূত হয়েছে, কাপালী-বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত লাল করে ফেলেছে, অনঙ্গ-বৌ একটু আনাড়ির মত আলুর একটুকু ধরে বৃথা টানটানি করতে গর্ত থেকে সেটাকে তুলবার প্রচেষ্টায়।

কাপালী-বৌ হেসে বললে—রাখো, রাখো বামুন-দিদি, ও তোমার কাজ নয়। দাঁড়াও একপাশে—

বলে সে এসে দ'হাত দিয়ে টানতেই আলুটা গর্ত থেকে বোরিয়ে এল।

অনঙ্গ-বৌ অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে—আমি পারলাম না—বাবাঃ—

—কোথা থেকে পারবে বামুন-দিদি—নরম রাঙা হাতের কাজ নয় ওসব।

—তুই যা—তোকে আর ব্যাখ্যান কতে হবে না মুখপুড়ী—

এমন সময় এক কান্ড ঘটলো। সেই ঘন ঝোপের দূর প্রান্তে একজন দাড়িওয়ালা জেয়ান মত চেহারার লোকের আকস্মিক আবির্ভাব হোল। লোকটা সম্ভবতঃ মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে নদীতীরের ঝোপের মধ্যে নারীকণ্ঠের হাসি ও কথাবার্তা শুনতে পেয়ে এদিকে এসেছে। কিন্তু তার ধরনধারণ ও চলনের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি দেখে সর্বপ্রথমে অনঙ্গ-বোয়ের মনে সন্দেহ জাগল। ভাল নয় এ লোকটার মতনব। ঝোপের মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েকে দেখেও ও কেন এদিকেই এগিয়ে আসছে? যে ভয় হলে সে এমন অশ্রুত আচরণ কেন করবে?

মতি এগিয়ে এসে বললে—তুমি কে গা? এদিক ঘেরেছেলে রয়েছে—এদিক কেন আসচো?

কাপালী-বৌও জনাস্তিকে বললে—ওমা, এ কান্দারা নোক গা?

লোকটার নজর কিন্তু অনঙ্গ-বোয়ের দিকে, অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। সে হন হন করে নোজা চলে আসছে অনঙ্গ-বোয়ের দিকে। অনঙ্গ-বৌ ওর কান্ড দেখে ভরে জড়সড় হয়ে মতির পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বুক টিপ টিপ করছে—ছুটে যে একদিনে পালাবে এ ভেদন জায়গায় নয়। তখনও লোকটা থামে নি।

মতি চেঁচিয়ে উঠে বললে—কোন নোক গা তুমি? ঠেলে আসচো যে ইদিকে বড়ো?

কাপালী-বৌ এসময়ে আরও পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ কাছাকাছি এসে লোকটা ওর দিকেও একবার কটমট করে চেয়েছে—মুখে কিন্তু লোকটা কোন কথা বলে নি।

এদিকে অনঙ্গ-বোয়ের মন্থন চলছে, ছুটে পালানো গিয়ে ওর চুল জড়িয়ে গিয়েছে শেরাকুল কাঁটায় আর কঁচ লতায়। বসন হয়ে গেছে বিস্রম। ঘাম ও পরিশ্রমে মুখ হয়েছে রাঙা। লোকটা ওর দিকে যেন অগ্নিশিখার দিকে পতঙ্গের মত ছুটে আসচে—কাছে এসে যেমন খপ করে অনঙ্গ-বোয়ের হাত ধরতে যাবে, মতি তাকে প্রাণপণ শক্তিতে মারলে এক ঠালা। সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ-বো বলে উঠলো—খবরদার! কাপালী-বো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

লোকটা ধাক্কা খেয়ে মেটে আলুর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল।

ততক্ষণ মতি এসে অনঙ্গ-বোকে কাঁটার বাধন থেকে মুক্ত করার প্রাণপণে চেষ্টা করচে। তার তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি। সে চেঁচিয়ে বললে—তোল তো শাবলটা কাপালী-বো—মিনসের মন্থুটা দিই গর্দভে করে ভেঙে—এত বড় আম্পন্দা!

অনঙ্গ-বো ষাঁড়ঝোপের নিবিড়তম অংশে ঢুকে গিয়েছে ততক্ষণ, ও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে। কারণ ঝোপ থেকে বেরবার পথ নেই বাইরে, সে সর্দি পথটাতে ওর আর মতির বন্ধ চলছিল। লোকটা গর্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করচে, মতি কাপালী-বোয়ের হাত থেকে শাবলটা নিচ্ছে—এই পর্যন্ত অনঙ্গ-বো বেখতে পেল। পালাবার পথ বন্ধ। অনঙ্গ-বো যেখানে ঢুকেছে সেখানে মানুষ আসতে হলে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চার হাতে-পায়ে আসতে হবে। বিষয় কঁচ কাঁটার লতাজাল। মাথার ওপর শাবল হাতে মতি মূর্চিনী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

লোকটা নিজের অবস্থা বুঝল। মতির হাত থেকে শাবল কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সে সে-পথেই এক-পা দু-পা করে পিছ হঠতে লাগলো।

একবারে ঝোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরে দিলে দোড়। মতি মূর্চিনী বললে—বেরিয়ে এসো গো বামুন-দিদি—পোড়ারমুখে মিনসে ভয় পেয়ে ছুট দিচ্ছে।

অনঙ্গ-বো তখনও কাঁপছে, তার ভয় তখনও যায় নি। কাপালী-বো ভয় পেলেও অনঙ্গ-বোয়ের মত ভয় পায় নি বা তার অতটা ভয় পাওয়ার কারণও ঘটে নি। সে হেসে ফেললে।

অনঙ্গ-বো ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসি আসচে কিসে পোড়ারমুখে?—চূপ, হাঁড়ির রস দ্যাখো না—

মতি মূর্চিনী বললে—ওই বোঝো।

সবাই মিলে এমন ভাবটা করলে যেন সব দোষটা ওরই।

কাপালী-বোয়ের ব্যস কম, দনস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কোঁড়ুকজনক মনে না হলে সে হাসে নি—হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ওঃ, মতি-দিদির সে শাবল তোলার ভঙ্গি, দেখে আমার তো—হি-হি-হি—

অনঙ্গ-বো ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসে!

—নাও, নাও, বামুন-দিদি আর রাগ কোরো না—

—হয়েচে। এখন চলো এখান থেকে বেরিয়ে—বেলা নেই।

এতক্ষণ ওদের যেন নৈনিকে দাঁড়ি ছিল না—এখন হঠাৎ ঝোপ থেকে উঁকি মেরে সবাই চেয়ে দেখলে সবাইপরের বাঁওড়ের ওপারে নোনাতলা গ্রামের বাঁশবনের আড়ালে কতক্ষণ

পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়েছে, ঘন ছায়া নেমে এসেছে বাঁওড়ের তীরে তীরে, বাঁওড়ের জলের কচুনি-পানার দামের ওপর। আবার কি উৎপাত না জানি হয়, সম্বোধনা। মাত্র তিনটি মেয়েছিলে তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বাবা—এখন বেরোও এখন থেকে।

মতি বললে—বা রে, মেটে আলুটা ?

—কি হবে তাই ?

—অত বড় মেটে আলুটা ফেলে বাবা ? কাল থাকবে ? এই মনদস্তরের সময় ?

কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগলো। থাকবে না মেটে আলু। আজকাল গ্রামের লোক সব যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সম্বধান পাবেই।

কাপালী-বৌ বললে—তাই করো বাবুন-দিদি। আলুটা নেওয়া যাক—নোক সব হনো হয়ে উঠেছে না খেঁতি পেয়ে। বুনো কচু আলু কিছু বাদ দিচ্ছে না, সম্বধা খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে জঙ্গলে। ওই আলুটা তুললে আমাদের তিন বেলা খাওয়া হবে।

আবার সবাই মিলে আলুর পিছনে লাগলো এবং যখন সকলে মিলে গর্ত হতে মেটে আলুটা বের করে উপরে তুলে ধরলো ঝড়ছে—তখন সম্বধার পাতলা অশ্বকার মাঠ-বন ঘিরে ফেলেছে। মতি মূচিনী নিজেই অত বড় ভারি আলুটা নিয়ে চললো, মধ্যে অনঙ্গ-বৌ, পেছনে শাবল হাতে কাপালী-বৌ। ওরা সেই সম্বধার অশ্বকারে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গ্রামে ঢুকবার আগে অনঙ্গ-বৌ বললে—এই ছর্দি, আজকের কথা ওই সব যেন কাউকে বলিস নে—

কাপালী-বৌ ঘাড় নেড়ে বললে—নাঃ—

—কন্ড পেট-আলুগা তুই, পেটে কোনো কথা থাকে না—

—কেন, কবে আমি কাকে কি বলিচি ?

—সে হিসেব এখন বসে বসে দেবার সময় নেই—মোটের ওপর একথা কারো কাছে—

—কোন কথা ? মেটে আলুর কথা ?

—আবার ন্যাকামি হচ্ছে ? দ্যাখ ছুটুকি, তুই কিন্তু দেখবি মজা আমার হাতে আজ। তুমি বৃদ্ধিতে পারচো না কোন কথা ? নেকু !

কাপালী-বৌ আবার হি-হি করে হেসে ফেললে—কি কারণে কে জানে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এ পাগলকে নিয়ে আমি এখন কি করি ? তুই বলবি ঠিক—না ?

কাপালী-বৌ হালি খান্নিরে আশ্বাস দেওয়ার সূত্রে বললে—পাগল বাবুন-দিদি ? তোমার নিয়ে যখন কথা, তখন ছেনো, কাগ-পাকিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-সূর্য্য নেই ?

বাড়ী এসে আলুর ভাগ নিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

গঙ্গাচরণ বেরিয়েছিল চাল ষোগাড়ের চেষ্টায়। কিন্তু ন হাটার হাতে যোর দান্দা আর লুটপাট হয়ে গিয়েছে—চালের দোকানে। পলিস এসে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। গঙ্গাচরণ বর্ণনা করে শ্রীর কাছে বসে সম্বধার পরে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এখন উপায় ?

—উপবাস।

অনঙ্গ-বৌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলে সে উপোস করতে ভয় খায় না, উপোস কি করে নি এর মধ্যে? কিন্তু এই যে উনি শূকনো মুখে এত দূর থেকে এসেছেন ফিরে, ও'কে এখন সে কি খেতে দেবে এই মেটে আলু সিঁধ ছাড়া? বাধ্য হয়ে দিতে হোল তাই। শূকর মেটে আলু সিঁধ। এক ভাল মেটে আলু সিঁধ। সবাইকে তাই খেতে হোল। দুর্গা পান্ডিত সম্প্রতি বাড়ী চলে গিয়েছে। ও'র আলু সৈন্ধ খানিকটা বাঁচবে। হাব, খেতে বসে বললে—এ মুখে ভাল লাগে না মা—

অনঙ্গ বললে—এ ছেলের চাল দ্যাখ না? মুখে ভাল না লাগলে কর্ণাচ কি?

মতি মর্দিনী খেতে এল না, কারণ সে ভাগের ভাগ আলু নিয়ে গিয়েছে, আলাদা করে আলু সৈন্ধ বা আলু পোড়া খেয়েছে।

পরদিনও আলু সৈন্ধ চললো। এ কি তাচ্ছলোর দ্রব্য? কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তবে ওইটুকু আলু সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে—ছেলের মুখে ভালো লাগে না তো সে কি করবে?

রাগিতে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, চাল না পাও, কিছুর কলাই আজ আনো। আলু ফুরিয়েছে।

—তাই বা কোথা থেকে আনি?

—পরমাণিকদের দোকানে নেই?

—সব সাবাড়। গুদোয় মাফ।

—কি উপায়?

—কিছুর নেই ঘরে? আলুটা?

—সে আর কতটুকু। কাল ফুরিয়েছে। তবুও তো এবার পান্ডিত ঠাকুর নেই—মতি নেই—নিজেরাই খেয়েছি।

—কাল থেকে কি হবে তাই ভাবাচি—

—চাল কোথাও নেই?

—আছে। প'য়ষটি টাকা মণ, নেবে? পারবে নিতে?

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—আমার হাতের একগাছা রুলি আছে, তাই বেচে চাল নিয়ে এসো।

তিন দিন কেটে গেল।

চাল তো দূরের কথা কোন খাবারই মেলে নাই। কলাইয়ের মণ ষোল টাকা, তাও পাওয়া দুল্কর।

কাপালী-বৌ না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, তার চেহারার আগের জলস আর নেই। সম্ম্যাবেলা পা টিপে টিপে অনঙ্গ-বোয়ের কাছে এসে বললে—কি করচো বামুন-দিদি?

—কসে আছি ভাই, রান্না-বান্না তো নেই।

—সে তো কারো নেই।

—কি খেয়েছিস? সত্যি বলবি?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

অনঙ্গ-বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজলো। কিছই পেলো না। তার ধারণা ছিল কাল রাত্রের আধখানা নারকোল বোধ হয় ঘরের কোথাও আছে, কিন্তু খিদের জ্বালায় ছেলেরা বোধ হয় কখন শেষ করে দিয়েছে, সে দেখে নি।

কাপালী-বৌ ওর নিকে চেয়ে রইল অশ্রুত দৃষ্টিতে। ওকে দেখে কষ্ট হয়।

একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আজ যাবো।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়-সুরে বললে—কোথায় যাবি ?

—ইটখোলায়।

—কোন ইটখোলায় ?

—দীঘির পারের বড় ইটখোলায়—জানো না ? আহা !

কাপালী-বৌ যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা শেষ করলে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সেখানে কেন যাবি রে ?

কাপালী-বৌ চূপ করে রইল নিচু-চোখে। অনঙ্গ-বৌ বললে—ছুটুকি !

—বলো গে তুমি বামন-দিদি। তোমার মতের দিকে চেয়ে আমি এতদিন জ্বাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি ? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামন-দি, পাপ হয়ে নরকে পড়ে মরবো সেও ভালো—

অনঙ্গ কোনো কথা বলবার আগে কাপালী-বৌ ততক্ষণ হন্ হন্ করে চলেচে বেড়ার বাইরের পথে।

অনঙ্গ-বৌ পিছনে ডাক দিলে—ও বৌ শূনে যা, যাস নি,—শোন ও বৌ—

পুরোনো ইটখোলার এদিকে একটা বড় শিমূল গাছের তলায় অশ্বকারে কে একজন দাঁড়িয়ে। কাপালী-বৌ আনাড়ির মত অশ্বকারে হোঁচট খেয়ে পথ চলে সেখানে পৌঁছলো।

দাঁড়িয়ে আছে পোড়া-যদু—বালো সর্বাঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, এখনও সে দাগ মেলায় নি—তাই ওর ওই নাম গ্রামের মধ্যে। পোড়া-যদুও বলে, আবার যদু-পোড়াও বলে। যদু ইটখোলায় কাঠ যোগান দেওয়ার ঠিকালার। মোটা পয়সা রোজগার করে।

যদু-পোড়া ওকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে, ইদিকি !

কাপালী-বৌ ভেঁচি কেটে বললে—ইদিকি ! দেখাতি পেইচি। এ অশ্বকারে আর ও ভুতের রূপ চোখ মেলে দেখাতি চাইনে। আঁতকে ওঠবো।

যদু-পোড়া ঝেঁষের সুরে বললে—তবু ভালো। তবুও যদি—

কাপালী-বৌ বাধা দিয়ে না থামিয়ে দিলে যদু-পোড়া একটা কি অশ্লীল কথার দিকে ঝুঁকিছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীরস রক্তসুরে বললে—কই চাল ?

—আছে রে আছে—

—না, দেরি আগে। কত কটি ?

—আধ পালি। তাই কত কষ্টে ষোঁগাড় করা। শূদু তোকে কথা দিইচি বলে।

—কে তোমার কাছে কথা পেড়েছিল আগে ? আমার কাছে তুমি কখন কথা দিইছিলে ? বাজে কথা কেন বলো ? আমি দেরি করতে পারবো না—সম্পদ হয়ে গিয়েছে—দেরি চাল আগে—তোমাকে আমার বিশ্বাস নেই—

যদু-পোড়া নিজের সততার প্রতি এ রুঢ় মন্তব্যে হঠাৎ বড় অবাক হয়ে উঠে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাপালী-বৌ আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো—আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু। সারারাত এ শিমুল তলায় তোমার মত শ্মশানের পোড়া কঠোর সংগে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? চললাম আমি—

যদু-পোড়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—শোন্ শোন্ ঘাস নে—বাবাঃ, এ দেখিচি বোড়ায় জিন দিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা—এই দ্যাখ চাল—এই ধামাতে—এই ঘে—যাপ রে, কি তেজ !

কাপালী-বৌ সদর্পে বললে—চূপ !

—আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু বলিচি নে—তাই বলিচি ঘে—

কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল ! পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া। অশ্বকার পথের দু'ধারে আশ-সেওড়া বনে জোনাকি জ্বলচে। কাপালী-বৌ তিরস্কারের সুরে বললে—পেছনে পেছনে কোন্ ষমের বাড়ী আসচো ?

—তোকে একটু এগিয়ে দি—

—ঢের হয়েছে। ফিরে যাও—

—অশ্বকারে যাবি কি করে ?

—তোমার সে দরদে কাজ নেই—চলে যাও—

—গায়ের লোক এ পথে আসবে না, ভয় নেই—

—সে ভয় করি নে আমি। আমাকে সবাই চেনে—তুমি যাও চলে—

তবুও যদু-পোড়া পিছন পিছন আসতে দেখে কাপালী-বৌ হঠাৎ দাঁড়িয়ে কাঁথের সুরে বললে—যাও বলিচি—কেন আসচো ?

যদু-পোড়া আদরের সুরে বললে—তুমি অমন করচো কেন হ্যাঁগো। বলি আমি কি পর ?

কাপালী-বৌ নীরস কণ্ঠে বললে—ওসব কথায় দরকার নেই। তোমাকে উপকার করতে কেউ বলচে না, যাও বলিচি, নইলে এ চাল সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তুু।

যদু-পোড়া এবার থমকে দাঁড়ালো। বললে—যাচ্ছি, যাচ্ছি—একটা কথা—

—কি কথা ?

—চাল আর কিছু আমি যোগাড় করিচি—পরশু সম্পবেলা আসিস।

—যাও তুমি—

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ার আঁচল পেতে শূয়ে আছে, গল্পাচরণ কোথায় বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি। অশ্ব-অশ্বকারে কে একজন দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে এসে দাঁড়ালো, অনঙ্গ-বৌ চমকে বলে উঠলো—কে ?

পরে ভাল করে চেয়ে দেখে বললে—আ মরণ ! মূখে কথা নেই কেন ?

কাপালী-বৌ মূখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হাসচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি মনে করে ?

—একটু নুন দেবা ?

—দেবো। কোথেকে এলি ?

—এলাম।

—বোস না—

—বোসবো না। খিদে পাই নি ?

—খাবি কি ?

কাপালী-বো আঁচল দেখিয়ে বললে—এই যে।

—কি ওতে ?

—চাল—দেখাও পাচ্চ না ? নুন দ্যাও দিনি। খাই গিয়ে—

—কোথায় পেলি চাল ?

—বলবো কেন ? তুমি দুটো রাখো বামুন-দিদি।

অনঙ্গ-বো গম্ভীর সুরে বললে—ছট্‌কি তোর বড় বাড় হয়েছে। যত বড় মূখ না তত বড় কথা—

—পায়ে পড়ি বামুন-দিদি ! নাও দুটো চাল তুমি—

—তোর মূখে আগুন দেবো—

—আচ্ছা বামুন-দিদি, আমরা নরকে পড়ে মরবো ঠিকই। আমাদের কথা বাদ দাও তুমি। তুমি সতীলক্ষ্মী, পারের ধূলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই—

অনঙ্গ-বোয়ের চোখে জল জল। সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

কাপালী-বো বললে—নেবা দুটো চাল ?

—না, ভুই যা—

—তবে মর গিয়ে। আমিই খাই গিয়ে। কই নুন দ্যাও—

নুন নিয়ে চলে গেল কাপালী-বো। কিছূদুর গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, ও বামুন-দিদি, আজ তুমি কি খেয়েচ ?

—ভাত।

—ছাই—সত্যি বলো !

—যা খাই তোর কি ? যা ভুই—

কাপালী-বো এগিয়ে এসে বললে—পায়ের ধূলো একটু দ্যাও—গঙ্গা নাওয়ার কাজ হয়ে যায়—

বলেই সে অনঙ্গ-বোয়ের দুই পায়ের ধূলো দুই হাতে নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গঙ্গাচরণ এসে পড়াতে সে ছুটে পালানো।

গঙ্গাচরণ বললে—ও কে গেল গা ?

—ছোট-বো কাপালীদের।

—কি বলছিল ?

—দেখা করতে এসেছিল। চাল পেলে ?

—এক জায়গায় সম্বান পেয়েছি। ষাট টাকা মন—ভার্বাচ কিছূ বাসন বিক্রি করি।

—তাতে ষাট টাকা হবে ?

—কুড়ি টাকা তো হবে। তেরো সের চাল কিনে আনি—আর না খেয়ে তো পরা যায় না, সত্যি বলিচ—

—তায় চেয়ে আমার সোনা-বাঁধানো শাখাটা বিক্রি করে এস। বাসন থাক গে—

—তোমার হাতের শাখা নেবো ?



—না নিলে অনাহারে মরতে হবে। যা ভালো বোঝো তাই করো।

পরদিন গঙ্গাচরণ শাখাজোড়া গ্রামের সর্ব স্যাক্‌বার দোকানে বিক্রি করলে। সর্ব স্যাক্‌রা বললে—এ জিনিস বিক্রি করবেন কেন ?

—দরকার আছে।

কিন্তু চাল পাওয়ার যে এত বিপুল বাধা তা গঙ্গাচরণ জানতো না। শংকরপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ী চালের সন্ধান একজন দিয়েছিল। খুব ভোরে পরদিন উঠে সেখানে পৌঁছে দেখলে দশজন লোক সেখানে থামা নিয়ে বসে। বাড়ীর মালিক তখনো ওঠে নি। নিবারণ দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরলে। সে বললে—আমার চাল নেই—  
গঙ্গাচরণ বললে—সে আমি জানি। তবুও তোমার মুখে শুনবো বলে এসেছিলাম—

গঙ্গাচরণ সেখানেই বসে পড়লো। চাল না নিয়ে ফিরবে কেমন করে। বাড়ীর সকলেই আজ দু'দিন থেকে ভাত খায় নি। ছেলেরদের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অন্য কয়েকজন লোক যারা এসেছিল, তারা একে একে সবাই ফিরে গেল। নিবারণ ঘোষ বাইরের বাড়ী আর ভেতর বাড়ীর মধ্যকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে নিবারণ ঘোষ আবার বাইরে এল। গঙ্গাচরণকে বসে থাকতে দেখে বললে—বাবাঠাকুর কি মনে করে বসে? চাল? সে দিতে পারবো না। ঘরে চাল আছে, সে তোমার কাছে অস্বীকার করতে যাচ্ছি নে—শেষে কি নরকে পড়ে মরবো? কিন্তু সে চাল বিক্রি করলি এরপর বাচ-কাচ না খেয়ে মরবে যে!

—কত চাল আছে ?

—দু' মণ।

—ঠিক ?

—না ঠাকুরমশাই, মিথ্যে বলবো না। আর কিছু বেশী আছে। কিন্তু সে হাতছাড়া করলি বাড়ীসুন্দুখ না খেয়ে মরবে। ট্যাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? ও জিনিস পয়সা দিলি মেলবে না।

গঙ্গাচরণ উঠবার উদ্যোগ করছে দেখে নিবারণ হাত জোড় করে বললে—একটা কথা বলি বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণ মানুুষ, এত দূর এয়েছেন চালির চেষ্টায়। আমি চাল দিচ্ছি, আপনি আমার বাড়ীতে দুটো রান্না করে খান। রসুই চড়িয়ে দিন গোয়ালঘরে। মাছ পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্ছি, মাছের ঝোল ভাত আর গরুর দুধ আছে ঘরে। এক পয়সা দিতি হবে না, আপনার।

গঙ্গাচরণ বললে—না, তা কি করে হয়? বাড়ীতে কেউ খায় নি আজ দু'দিন। ছেলেরা পলে রয়েছে, তা হয় না। তুমি আমাকে রান্নার জন্যে তো চাল দিতেই, আর দুটো বেশী করে দাও। আমি দাম দিয়ে নেবো। ষাট টাকা করেই মণ দেবো, কিছু বেশী না হয় নাও।

নিবারণ কিছুতেই রাজী হোল না। তার ওপর রাগ করা যায় না, প্রতি কথাতেই সে হাত জোড় করে, এখানে বসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করে রেখেছেই। গঙ্গাচরণ চলে আসছে, নিবারণ এসে পথের ওপরে আবার তাকে হাত জোড় করে রান্না করে খাওয়ার অনুরোধ জানালে।

গঙ্গাচরণ রাগ করে বললে—আমি কি তোমার বাড়ী খেতে এসেছি? যাও যাও—  
ওকথা বলো না—

কিন্তু গঙ্গাচরণের মনের মধ্যে আর সে জোর নেই। হঠাৎ তার মনের চক্রে ভেসে উঠছে, দিব্য হিঙের টোপা টোপা বড়ি ভাসছে মাছের খোলে, আলু বেগুন, বড় বড় চিংড়ি মাছ আধ-ভাসা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে বাটির ওপর। ভাতে সেই মাছের কোল মাখা হয়েছে। কাঁচা ঝাল একটা বেশ করে মেখে—

নিবারণ বললে—আসুন, চলুন। আমার একথা আপনাকে রাখতেই হবে। সে শোনবো না আমি। দুপুরবেলায় না খেয়ে বাড়ী থেকে ফিরে যাবেন?

হাব, ভাত খায় নি আজ দু'দিন। অনঙ্গ-বৌ খায় নি দু'দিনেরও বেশি। ওষে কি খায়-না-খায় গঙ্গাচরণ তার খবর রাখে না। নিজেকে না খেয়েও সবাইকে দু'গিয়ে বেড়ায়। তার খাওয়া কি এখানে উচিত হবে? গঙ্গাচরণ নিবারণকে বললে, আজ্ঞা যদি খাই, তবে এক কাঠা চাল দেবে?

—না বাবাঠাকুর। মিথো বলে কি হবে। চাল হাতছাড়া করবো না। আপনি এফা এখানে বসে আধ কাঠা চাল রেখে খান তা দেবো।

—তোমার জেদ দেখিচি কম নয়।

—এই আকালে এমনি করেছে। ভয় ঢুকে গিয়েছে যে সবারই।

—চাল আর যোগাড় করতে পারবে না?

—কোথা থেকে করবো বলুন! কোন মহাজনের ঘরে ধান নেই। বাজারে এক দানা চাল আনে না। আমাদের গেরামের পেছনে একটা বিল আছে জানেন তো? দাসপাড়ার বিল তার নাম। এখন এই তো বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখুন সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে-মানুষ জুটেছে এতক্ষণ। জলে পাকের মর্দি নেমে পশম গাছের মূল তুলছে, গেঁড়ি-গুর্গলি তুলছে—জন-কাঁকির পাতা পর্যন্ত বাদ দেয় না।

—বল কি?

—এই যাবার সময় দেখবেন সত্যি না মিথো। যত বেলা হবে তত লোক বাড়বে, বিলির জল লোকের পায়ে পায়ে যোল দই হয়ে যাবে কাদা ঘুলিয়ে। এক-একজন কালামাখা পেহরীর মত চেহারা হয়েছে—তবুও সেই কাদা জলে ডুব দিয়ে পশমের মূল, গেঁড়ি-গুর্গলি এসব খুঁজে বেড়াচ্ছে। চেহারা দেখালি ভয় হয়। তাও কি পাচ্ছে বাবাঠাকুর? বিল তো আর অফুরন্ত নয়। যা ছিল, তিন দিনের মধ্যে প্রায় সাবাড় হয়ে গিয়েছে। এখন মনকে চোখ ঠারা।

—তবে যাচ্ছে কেন?

—আর তো কোথাও কিছু খাবার নেই। যদি তবুও বিলের মর্দি খুঁজলি পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বাবাঠাকুর, আপনাকে যদি চাল বেচি, তবে একদিন আমার বাড়ীর ঝি-বউদের অর্মান করে পাক মেখে বিলের জলে নামতে হবে দুটো গেঁড়ি-গুর্গলি ধরে খাবার জর্নি। চলুন, বাবাঠাকুর, আসুন, দুটো খেয়ে যান। পেট ভর্তি চাল দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ ফিরলো। মাছের কোল ভাত খেয়ে—গেঁড়ি-গুর্গলি সেশম নয়। এখনো এ গ্রামের এ দিনেও ভাত খেতে পাওয়া যাচ্ছে। এর পরে আর পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

গোয়ালঘর নিকিয়ে পড়েছিলে নিবারণের বিধবা বড়মেয়ে ক্যাস্তমণি। কঠ নিয়ে

এসে এক পাশে রাখলে। গঙ্গাচরণ পুকুরের জলে স্নান করে আসতেই ক্যাস্ত্রমার্গ তসরের কটে-কাপড় কর্চিয়ে হাতে দিলে। রান্নার জন্য কুটনো বাটনা সব ঠিক করে এনে দিলে। একবার হেসে বললে—দাদাঠাকুর, অতটা নুন? পুড়ে যাবে যে বেশন।

—সেবো না?

—বেশন মুখে দিতে পারবেন না। আপনার রসুই করবার অভ্যাস নেই বুঝি?

—না।

—আপনি বসে বসে রাঁধুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ক্যাস্ত্রমার্গ যে বেশ ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ অল্প সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে পারলে। কোথা থেকে একটু আখের গুড় গাওয়া ঘি যোগাড় করে নিয়ে আসে। যাতে গঙ্গাচরণের খাওয়াটা ভাল হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য। খেতে বসে গঙ্গাচরণের কিন্তু ভাত যেন গলা দিয়ে নামে না—আশ্বর্ষের কথা, হাবদুর জন্যে দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়—দুঃখ হোল অনঙ্গ-বোয়ের জন্যে। সে আজ দুদিন খায় নি। তার চেয়ে হয়তো আরও বেশি দিন খায় নি। গুখ ফুটে তো কোনো দিন কিছু বলে না।

—আর একটু আখের গুড় দি?

—না। এ দুধ তো খাঁটি, গুড় দিলে সোয়াদ নষ্ট হয়ে যাবে।

এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ভুবিয়ে সে ঝাঞ্চে এখানে, ওখানে অনঙ্গ-বো হয়তো উঠানের কাঁটানটের শাকের বনে চুর্বাড়ি নিয়ে ঘুরচে, অথবা কাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে। নইলে বেলা হোতে না হোতে পাড়ার ছেলমেয়েরা এসে জুটেবে। তাদের উৎপাতে গাছের পাতাটি থাফবার জো নেই।

ক্যাস্ত্রমার্গ পান আনতে গেল। পাতে দুটি ভাত পড়ে আছে—গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হোল ভাত দুটি সে বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে? চাদরের মূড়োয় বেঁধে? ছিঃ—সবাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাদরের মূড়োয় বেঁধে নেবে?

গঙ্গাচরণ বসে বসে মতলব ভাঁজতে লাগলো। কি করা যাবে? কলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাড়ি একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো! তাতে কে কি মনে করবে? বড় লজ্জা করে যে। অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবুও চার-পাঁচ গ্রাস হবে অনঙ্গ-বোয়ের। বড় বড় চার-পাঁচ গ্রাস। নিয়ে যাবেই সে। কিসের লজ্জা? এমন সময়ে ক্যাস্ত্রমার্গ এসে পান দিতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণের সাহস চলে গিয়ে রাজ্যের লজ্জা ও সম্ভ্রাচ এসে জুটলো। দিবা সূন্দরী মেয়ে, ষে'বন-পুন্ট দেহটিক দিকে বার বার চেয়ে দেখেও আশ মেটে না। কালো চুল নাথায় একতাল, নাকের ডগায় একটা ছোট তিল। মুখে দু-দশটা বসন্তের দাগ আছে বটে, তবুও ক্যাস্ত্রমার্গর সূত্রী মুখ।

গঙ্গাচরণ বললে—ক্যাস্ত্র, তোমার বসন্ত হয়েছিল?

—হ্যাঁ দাদাঠাকুর। আজ তিন বছর আগে।

—ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে ও দাগ কটা আর থাকতো না।

—আপনিও যেমন দাদাঠাকুর। আর কি হবে মুখের চেহারা নিয়ে বলুন। সে দিন চলে গিয়েছে, কপাল বোদিন পুড়েছে, হাতের নোরা ধুচেছে। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন ভালোর ভালোর ষেতে পারি।

তারপর চুপি চুপি বললে—আপনি ওই পুকুরের বাঁশঝাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে।  
গঙ্গাচরণ সর্বিশ্বয়ে বললে—কেন ?

—চুপ চুপ। বাবাকে লুকিয়ে দড়টো চাল দিচ্ছি আপনাকে। কাউকে বলবেন না।  
আধ পালিটাক চাল আমি আলাদা করে রেখে দিইঁচি আপনার রাখার চাল আনবার সময়।  
নিয়ে যান চাল কটা। আপনার মন খারাপ হয়েছে বাড়ীর জন্য আমি তা বুঝতে পেরেঁচি।

মেয়েরাই লক্ষ্মী। মেয়েরাই অন্নপূর্ণা। বড়ুস্কু জীবের অন্ন ওরাই দূ'হাতে বিলোয়।  
ক্যাস্তিমাগকে আঁচলের মুড়োতে লুকিয়ে চাল আনতে দেখে দূর থেকে গঙ্গাচরণের ওই কথাই  
মনে হলে। ক্যাস্ত গঙ্গাচরণের পায়ে ধুলো নিয়ে বললে—হাতে করে দড়টো চাল দোবো  
ব্রাহ্মণকে, এ কত ভাগ্য! কিন্তু বাবাঠাকুর, যে আকাল পড়েছে, তাতে কাউকে কিছু  
দেবার জো নেই। সবই অদেউট। লুকিয়ে নিয়ে যান—

—লুকিয়েই নিয়ে যাচ্ছি—

—না লুকিয়ে নিয়ে গেলি নোকে চেয়ে নেবে। না দিলি কাম্বাকাটি করবে, এমন  
মুশকিল হয়েছে।...আমাদের গায়ে তো দোর বন্ধ না করে দূ'পূরে খেতে বসবার জো  
নেই। সবাই এসে বলবে, ভাত দ্যাও। দেখে দূ'বুও হয়—কিন্তু কজজনকে ভাত দেবেন  
আপনি? খামতা যখন নেই, তখন দোর বন্ধ করে থাকাই ভালো। একটা কথা  
বলি—

—কি ?

—যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবে আমার কাছে আসবেন, আমি যা  
পারি দেবো। আমার নিজের সোয়ামী-পুস্তুর নেই, দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না  
করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন!

বাড়ী ফিরবার পথে নসরাপূরের বিলের ধারে একটা দোকান। বেলা পড়ে এসেছে।  
দোকানীকে তামাক খেতে দেখে গঙ্গাচরণ দোকানে গিয়ে উঠে বললে—তামাক খাওয়াও  
দিকি একবার—

দোকানী বললে—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ !

—পেরগাম হই।

—জয়ন্তু।

দোকানী উঠে গিয়ে একটা কনার পাতা নিয়ে এসে ঠোঙা করে কন্কে বসিয়ে গঙ্গাচরণের  
হাতে দিলে—বললে—আপনার নিবাস ?

—নতুন পাড়া, চর পোলতা।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—নিবারণের বাড়ী, ও গায়ের নিবারণ ঘোষ।

—বাবাঠাকুরের পর্নটুলিতে কি ? চাল ?

—হ্যাঁ বাপু।

—টেকে রাখুন। এসব দিকে বস্ত আকাল। এখন এসে ঘ্যান ঘ্যান করবে সবাই।  
গঙ্গাচরণ বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটি দূলে বাগাদি জাতীয় শ্রীলোক এসে আঁচলে

বে'ধে কলাই নিয়ে গেল। একজন নিয়ে গেল অপকৃষ্ট পাতা চা ও একটা ছোট্ট পাথরবাটিতে একবাটি গড়। দোকানী বললে—বসুন ঠাকুরমশায়—

—না বাপদে, আমি যাবো অনেক দূর, উঠি।

—না, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে। আর তো কিছু দেওয়ার নেই, বসুন—

—চা খাবো আবার—

—হ্যাঁ, একটুখানি খেয়ে যান দয়া করে।

—আরও পাঁচ-ছটি খন্ডের দোকানে এল গেল। সকলেই নিয়ে গেল কলাই। শুধু কলাই, আর কিছু নয়।

চা একটু পরে তৈরি হয়ে এল, একটা কাঁচের গ্রাসে করে দোকানী ওকে চা দিলে। গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করলে দোকানের মধ্যে তাকে, মেজের ওপর, নানা জায়গায় পেতল কাঁসার বাসন ধরে ধরে সাজানো। বেশির ভাগ থালা আর বড় বড় জাম বাটি। গঙ্গাচরণ ব্যাপারটো বুঝতে পারলে না, এরা কি কাঁসারি? বাসন কেন এত বিস্তার জন্মো?

দোকানী আবার তামাক সাজলে। গঙ্গাচরণের মনের কথা বুঝতে পেয়ে বললে—ও বাসন অত দেখছেন, ওসব বাঁধা দিয়ে গিয়েছে লোকে। এ গাঁয়ে বেশির ভাগ দূলে বাগদি আর মালো জাতের বাস। নগর পয়সা দাঁতি পারে না, ওই সব বাসন বাঁধা দিয়ে তার বদলে কলাই নিয়ে যায়।

—সবাই কলাই খায়?

—তা ছাড়া কি মিলবে ঠাকুরমশায়। ওই খাচ্ছে—

—তোমার চাল নেই?

—না ঠাকুরমশায়।

—আমি দাম দেবো, সত্যি কথা বলো। নগর দাম দেবো।

—না ঠাকুরমশায়। হাত জোড় করে বর্নাচি ও অনুরোধ করবেন না!

—তোমরা কি খাও বাড়ীতে?

—মধ্যে কথা বলবো না, ভাত চার আনা, কলাই বারো আনা। ডাঁটা শাক দুটো করেলাম বাড়ীতে, তা সে রাখবার উপায় নেই। দিনমানেই ক্ষেতে লোকজন, মেয়েছেলে, খোকা-খুকীরা ঢুকে গোছা গোছা উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাবাড় করে দিয়েছে সব। কিছু রেখে খাবার জো নেই। চালকুমড়া ফলোছিল গোটাকতক এই দোকানের চালে, কে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

গঙ্গাচরণ তামাক খাওয়া সেরে ওঠাবার যোগাড় করলে। দোকানী বললে—ঠাকুরমশায় কলাই নেবেন?

—নাও।

—নিয়ে যান সেরখানেক। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর একটা জিনিস—দাঁড়ান, গোটাকতক পেয়ারা দিই নিয়ে যান, আমার গাছের ভালো পেয়ারা—তাও আর কিছু নেই, সব পেড়ে নিয়ে গেল ওরা। আমি ডাঁসা দেখে দশ-বারোটা জোর করে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম।

গঙ্গাচরণ বাড়ী পৌঁছে দেখলে অনঙ্গবৌ চুপ করে শয়ে আছে। এমন সময়ে সে কখনো শয়ে থাকে না।

গঙ্গাচরণ জিজ্ঞেস করলে—শুয়ে কেন? শরীর ভালো তো? দেখি—

অনঙ্গ-বৌ ষষ্ঠগাভার হয়ে বললে—কাউকে ডাকো।

—শাকে ডাকবো?

—কাপালীদের বড়-বোকে ডাকো চট করে। শরীর বস্ত খারাপ।

গঙ্গাচরণ বড় ছেলেকে বললে—দৌড়ে যা কাপালী-বাড়ী—বল্গে একদু'গ আসতে হবে।

মার শরীর খারাপ—

অনঙ্গ-বৌ ষষ্ঠগায় চীৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো বসে। মৃদুপব্ধ আর্ত পশুর মত চীৎকার। গঙ্গাচরণ নিরুপায় অবস্থায় বাইরের দাওয়ার বসে তামাক টানতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আকাশে পঞ্চমী তিথির এক ফালি চাঁদও উঠেছে। কি'কি' ডাকছে লেবু-ঝোপে। গঙ্গাচরণ আর সহ্য করতে পারছে না অনঙ্গ-বোয়ের চীৎকার। ওর চোখে প্রায় জল এল। ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আশেপাশের বাড়ীর মেয়েছলে এসে গিয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সীকে ডেকে গঙ্গাচরণ উদ্ভাস্ত সুরে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দিদমা, বলি ও অমন করছে কেন?

ঠিক সেই সময় একটা ঘেন মৃদু গোলমাল উঠলো। একটি শিশুকণ্ঠের টা টা কান্না শোনা গেল। বার-কয়েক শাকি বেজে উঠলো।

সতীশ কাপালীর মেয়ে বিন্দু বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এসে বললে—ও দাদাবাবু, বৌদিদির খোকা হয়েছে—এখন সম্পেশ বের করুন আমাদের জন্যে—দিন টাকা—

গঙ্গাচরণের চোখ বেয়ে এবার সাতাই ঝর ঝর করে জল পড়লো।

তার পর দিনকতক সে কি কষ্ট! প্রসূতিকে খাওয়ানোর কি কষ্ট। না একটু চিনি, না আটা, না মিছরি। অনঙ্গ-বৌ শুয়ে থাকে, নবজাত শিশু টা-টা করে কাঁদে, গঙ্গাচরণ কাপালীদের বড়-বোকে বলে—ওর খিদে পেয়েছে, মধু একটু মধু দ্যাও খুড়ী—

—মধু খেয়ে বমি করেছে দু'বার। মধু পেটে রাখছে না।

—তবে কি দেবে খুড়ী, মধু একটু জ্বাল দিয়ে দেবো?

—অত ছোট ছেলে কি গাইয়ের মধু খেতে পারে? আর ইদিকি আঁতুড়ে-পোষাতি ঘরে, তার খাবার কোনো যোগাড় নেই। হিম হয়ে বসে থাকলে চলবে না বাবাঠাকুর, এর যোগাড় কর।

গ্রামে কোন কিছুর মেনে না, হাটেবাজারেও না। আটা সূঁজি বা চিনি আনতে হোলে যেতে হবে মহকুমা শহরে সাপ্লাই অফিসারের কাছে। গঙ্গাচরণ দু-একজননের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলে, মহাকুমা শহরেই যেতে হবে।

সাড়ে সাত ক্রোশ পথ।

সকালে রওনা হয়ে বেলা এগারোটোর সময় সেখানে পেঁছলো। এখানে দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গাচরণের হাতে পয়সা নেই, জলখাবারের জন্য মাত্র দু'আনা রেখেছিল, কিন্তু খাবে কি, চি'ড়ে পাঁচসিকে সর, ম'ড়িও তাই। ম'ড়িকি চোখে দেখবার জো নেই। দু'আনার ম'ড়ি একটা ছোট্ট বাটিতে ধরে।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ও দাদাঠাকুর, এ বে জ্ঞানক কাণ্ড দেখছি। খাবা কি ?

গংগাচরণ ও ক্ষেত্র কাপালী সাপ্তাহি অফিসারের অফিসে এসে দেখলে সেখানে রথযাত্রার ভিড়। আঁপিসঘরের জানলা দিয়ে পারামিট বিলি করা হচ্ছে, লোকে জানলার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পারামিট নিচ্ছে। সে ভিড়ের মধ্যে ছাত্রী জাতির মহাসম্মেলন। দস্তুরমত বলবান ব্যক্তি ছাড়া সে বৃহৎ ভেস করে ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে তাড়া শোনা যাচ্ছে, লোকজন কিছু কিছু পিছিয়ে আসচে, কিছুরূপ পরেই আবার পূর্বের অবস্থা, ভিড়ের স্থিতিস্থাপকতা দিবা বেশি।

গংগাচরণ হতাশভাবে কিছুরূপ অপেক্ষা করলে। ভিড় কমবার নাম নেই,—বরং ক্রমবর্ধমান। গরমও তেমনি, আকাশে মেঘ জমে গুমটের সৃষ্টি করেছে। এক ঘণ্টা কেটে গেল—হঠাৎ ঝুপ করে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল হাকিম আহার করতে গেলেন, আবার কখন আসবেন তার কিছু ঠিক নেই। ভিড় ক্রমে পাজলা হয়ে এল—লোকজন কতক গিয়ে আঁপিসের সামনে নিম্নগাছের তলায় বসে বিড়ি টানতে লাগলো।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ঠাকুরমশাই, কি করবেন ?

—বসি এসো।

—চলুন, বাজারে গিয়ে খোঁজ করি। যদি দোকানে পাই। এ ভিড়ে ঢুকতি পারবেন না।

বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে খোঁজ করা হোল। জিনিস নেই কোনো দোকানে। পাতিরাম কুঁড়ুর বড় দোকানে গোপনে বললে—সুর্জি দিতে পারি, দেড় টাকা সের। সন্দুকয়ে নিয়ে যাবেন সন্দের পর।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—আটা আছে ?

—আছে, বারো আনা করে সের।

—মিছরি ?

—দেড় টাকা সের। সন্দের পর বিক্রি হবে।

গংগাচরণ হিসেব করে দেখলে, কাছে ষা টাকা আছে তাতে বিশেষ কিছু কেনা হবে না। পারামিট পেলে সস্তায় কিছু বেশি জিনিস পাওয়া যেতে পারে। আবার ওরা দুজনে সাপ্তাহি অফিসারের আঁপিসে এল, তখন ভিড় আরও বেড়েচে, কিন্তু জানলা খোলে নি।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে আছেন। গংগাচরণ বিড়ি খাওয়ার জন্য তার কাছে গেল। জিজ্ঞাস করলে—আপনার নিবাস কোথায় ?

—মালিপোতা।

—সে তো অনেক দূর। কি করে এলেন ?

—হেঁটে এলাম, আবার কিসে আসবো ? গরীব লোক, এ বাজারে নোকো কি গাড়ীভাড়া করে আসবার খামতা আছে ?

—কি নেবেন ?

—কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসী ঘরে, তাঁর একাদশী আসচে। দশমীর দিন রাস্তিরে দুখানা রুটি করেও তো খাবেন। তাই আটা নিতে এসেচি।

—চাল পাচ্ছেন ওঁদিকে ?

—পাবো না কেন, পাওয়া যায়। দু'টাকা কাটা—তাও অনেক খরজে তবে নির্ভি হবে।  
খাওয়া হয় না মাঝে মাঝে।

এই সময় জানলা খোলার শব্দ হতেই লোকের ভিড় সেই দিকেই ছুটলো। গঙ্গাচরণ  
বৃন্দের হাত ধরে বললে—শীগ'গির আসুন, এর পর আর জায়গা পাব না—

তাও এরা পিছিয়ে পড়ে গেল। অতগুলো মরীয়া লোকের সঙ্গে দৌড়পাল্লায়  
প্রতিযোগিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হোল না। এদের পক্ষে বেশির ভাগ এসেচে আটা  
যোগাড় করতে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে দু'পূর্ববেলা চাল যোগাড় না করতে পেরে  
উপবাসে আছে, একটু আটা নিয়ে গেলে তবে তার দিনের আহার পেটে পড়বে। তারা মরীয়া  
হবে না তো মরীয়া হবে কে ?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গঙ্গাচরণ জানলার সামনে দাঁড়াবার জায়গা পেলে।  
সাপ্রাই অফিসার টানা টানা কড়া সূরে জিজ্ঞেস করলেন—কি ?

গঙ্গাচরণের ভরসা ছিল তার চেহারার দিকে চাইলে সাপ্রাই অফিসার ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ  
বলে খাতির করবে। কিন্তু তাতে নিরাশ হতে হোল, কারণ হাকিম চোখ তুলে তার দিকে  
চাইলেন না। তার চোখ টেবিলের ওপরকার কাগজের দিকে। হাতে কলের কলম, অর্থাৎ  
যে কলম কার্ণালিতে ডোবানোর দরকার হয় না।

গঙ্গাচরণের গলা কেঁপে গেল, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে লাগলো। হাত-পা কাঁপতে  
লাগলো।

সে বললে—হুজুর, আমার শ্রী আঁতুড়ে। কিছু খাবার নেই, আঁতুড়ের পোলাতি, কি  
খায়, না আছে একটু আটা—

হাকিম ধমকের সূরে বললেন—আঃ কি চাই ?

—আটা, চিনি, সূর্জি, একটু মিছরি—

—ওসব হবে না।

—না দিলে মরে যাবো হুজুর। একটু দয়া করে—

—হবে না। আধসের আটা হবে, একপোয়া সূর্জি, একপোয়া মিছরি—

বলেই খস্ খস্ করে কাগজে লিখে হাকিম গঙ্গাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—যাও—

—হুজুর, পচি-ছ'কোশ দু'র থেকে আসিচি। এতে ক'দিন হবে হুজুর। দয়া করে

কিছু বেশি করে দিন—

—আমি কি করবো ? হবে না যাও—

গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে বললে—গরীব ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমায়—

হাকিম বিরক্তির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখ কাগজ ? যাও, এক সের আটা—যত

বিরক্ত—

লোকজনের থাকায় গঙ্গাচরণকে ছিটকে পড়তে হোল জানলা থেকে। পেছন থেকে  
দু'একজন বলে উঠলো—ওমা, দে'র করো কেন ? কেমনধারা লোক তুমি ? সরো—

চাপরাসী চে'চিয়ে বললে—হঠ, যাও—

বাজারে দোকান থেকে আটা কিনতে গিয়ে দেখলে আটা এবং সূর্জি দুই-ই খারাপ  
একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত নয় বটে তবে জিনিস ভালও নয়।

ছ. বি. র. স্মৃতিভ ঔয়—৬



একটা ময়রার দোকানে ওরা খাবার খেতে গেল। ক্ষেত্র কাপালীর বড় ইচ্ছে সে গরম সিঙাড়া খায়। শহর বাজারে তো প্রায় আসা হয় না—থাকে নিতান্ত অল্প পাড়াগায়ে। কিন্তু খাবারের দোকানে সিঙাড়া কিনতে গিয়ে সে দেখলে পানের ঝিল অপেক্ষা একটু বড় সিঙাড়া একখানার দাম দ্দু পয়সা। জ্বিনিসপত্রের আগুন দর। সন্দেশের সের এ অঞ্চলে চিরকাল ছিল দশ আনা, বারো আনা, এখন তাই হয়েছে তিন টাকা। রসগোল্লা দু' টাকা। ক্ষেত্র কাপালী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—কোনো জ্বিনিস কিনবার জো নেই ঠাকুরমশাই!

—তাই তো দেখছি—

—কি খাবো বলুন তো। এ তো দেখছি এক টাকার কম খেলি পেট ভরবে না। আপনি খাবা না?

—না, আমি কি খাবো। আমার খিদে নেই।

—সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দু'জনে ভাগ করে খাই। গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—কেন মিছে মিছে বাজে কথা বলিস? খেয়ে নিগে যা—কিন্তু গঙ্গাচরণের বড় লোভ হোল একখানা খালায় সাজানো বড় বড় জোড়া সন্দেশ দেখে। তার নিজের জন্যে নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোন জ্বিনিস খায় নি। ওর জন্যে যদি দু'খানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।

ক্ষেত্র কাপালী গরম সিঙাড়া খেয়ে জল খেয়ে পানের দোকানে পান কিনতে গিয়েচে—ও তখন ময়রাকে বললে—তোমার ঐ জোড়া সন্দেশের দাম কত?

—চার আনা করে।

—দু'খানা চার আনা?

—সেকাল নেই ঠাকুর। একখানার দাম চার আনা।

গঙ্গাচরণ অবাক হোল। ওই জোড়া সন্দেশের একখানির নাম ছিল এক আনা। সেই জারগায় একেবারে চার আনা! সে কি কেনা ওর চলবে? অসম্ভব। হাতে অত পয়সা নেই। গঙ্গাচরণ বার বার জোড়া সন্দেশের দিকে চাইতে লাগলো। সুন্দর সন্দেশ গড়েচে। কারিগর ভালো।

ঠোঙা থেকে বের করেই যদি অনঙ্গর হাতে দেওয়া যেতো!

—ওগো, দ্যাখো কি এনেচি—

—কি গা?

—কেমন জোড়া সন্দেশ, দেখেচ? তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

কখনো শ্রীর হাতে কোনো ভাল খাবার চুলে দেয় নি। পাবেই বা কোথায়? কবে সঞ্চল পয়সার মূখ দেখেচে সে? তার ওপর এই ভীষণ মন্বন্তর।

ক্ষেত্র কাপালীর কাছেও পয়সা নেই যে ধার করবে। সে পেটুক ব্যক্তি। বসে বসে, যা কিছু এনেছিল, জ্বিনিস আর সিঙাড়া কিনেই বায় করেছে।

বেলা পড়ে এসেচে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাক্ষা। দু'জনে পথ হেঁটে চললো গ্রামের দিকে। ক্ষেত্র কাপালী বিড়ি টানচে আর বকবক করে বকচে। গঙ্গাচরণ চাদরের প্রান্তে দুটি মূড়ি-মূড়ি বেঁধে নিয়েচে—মাগ্ন দু'আনার। এত অল্প জ্বিনিস যে কয়েক মূঠো খেলেই

ফুরিয়ে যাবে। ছেলে দুটো বাড়ীতে আছে, বলবে এখন, বাবা কি এনেচ আমাদের জন্যে? ছেলেমানুষ, তারা কি মস্তুর বোঝে? তাদের জন্যে দুটো নিয়ে যেতে হবে, দুটো ও খাবে একটা ভাল পরিষ্কার জয়গায় বসে। খেয়ে নদীর জল পান করবে। সারাদিন অনাহার, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই প্রবল!

এক জয়গায় গাছতলায় বসে গঙ্গাচরণ দু'তিন মূঠো মূড়ি-মুড়িকি খেয়ে নিয়ে জলে নামতে গিয়ে দেখলে একটা শেওলা দামের ওপারে অনেক কলমীশাক। আজকাল দু'ল'ভ, শাক-পাতা কি লোক রাখচে? ক্ষেত্র কাপালীকে বললে—জলে নামতে পারবি? শাক নিয়ে অন্ন তো দিকি—

ক্ষেত্র কাপালী গমছা পরে জলে নেমে একগলা জল থেকে দাম টেনে এনে কলমীশতায় ঝাঁক ডাঙায় কাছে তুললে। তারপর দু'জনে মিলে শাক ছিঁড়ে বড় দু'আঁটি বাঁধলে।

বাড়ী ফিরতেই অনঙ্গ-বৌ ক্ষীণস্বরে বললে—ওগো, এলে? এদিকে এসো—

—কেমন আছ?

—এখানে বোসো। কোথায় গিইছিলে এতক্ষণ? কতক্ষণ যেন দেখি নি—

—টাউনে গেলাম তো। তোমাকে বলেই তো গেলাম। জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম সব।

অনঙ্গ নিশ্চিন্দ, উলস সুরে বললে—বোসো এখানে। সারাদিন টো টো করে বেড়াও কোথায়? তোমায় একটুও দেখতে পাই নে।

গঙ্গাচরণের মনে বড় কষ্ট হোল ওকে দেখে। বড় দু'ব'ল হয়ে পড়েচে অনঙ্গ-বৌ। এমন ধরণের কথাবার্তা ও বড় একটা বলে না। এ হোল দু'ব'ল রোগীর কথাবার্তা। অনাহারে শীর্ণ, দু'ব'ল হয়ে পড়েচে, কতকাল ধরে পেট পুরে খেতে পেতো না, কাউকে কিছু ম'খ ফুটে বলা ওর স্বভাব নয়, কত সময় নিজের বাড়া ভাত অপরকে খেতে দিয়েচে। শরীর সে সবের প্রতীশোধ নিচ্ছে এখন।

গঙ্গাচরণ সশ্বেন্দে বললে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমাকে জোড়া সশ্বেন্দে এনে খাওয়াবো টাউন থেকে। হাঁর ময়রা যা সশ্বেন্দে করেচে! দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়েচে, কিন্তু বড় দু'ব'ল, শীর্ণদেহ। খেতেই পায় না তা সারবে কোথা থেকে। গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেষ্টা করে খাবারের এটা সেটা যোগাড় করতে, কিন্তু পেরে ওঠে না। একটু ঘি কত কষ্টে গঙ্গানন্দপুরের শশী ঘোষের বাড়ী থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও ঘোষশায় আট টাকা দেরের কমে ছাড়তে চায় না। ব্রাহ্মণদের নোহাই দিয়ে অনেক করে ঘিটুকু যোগাড় করা।

ঘি যদি বা মেলে দু'র গ্রামে, নিজ গ্রামে না মেলে একটু দু'ধ, না একটু মাছ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওগো, তুমি টো টো করে অন্ন বোড়িও না। তোমার চেহারাটা খারাপ হয়ে গিয়েচে। আয়নায় ম'খখানা একবার দেখো তো—

গঙ্গাচরণ বললে—দেখা আমার আছে। তুমি ঠা'ডা হও তো।

—তাল পেয়েছিলে?

—অল্প যোগাড় করেছিলাম কাল।

—তোমরা খেয়েছ?

—হঁ।

অনঙ্গ-বো আঁতুড় থেকে বেরুলেও নড়তেচড়তে পারে না—শুয়েই থাকে। রান্না করে গঙ্গাচরণ ও হাব্দ। পাঠশালা আক্রমণে সবদিন হয় না। বিশ্বাসমশায় এখন থেকে সরে যাওয়াতে পাঠশালার অবস্থা ভাল নয়। এ দুদিনে আকস্মিক বিপৎপাতের মত দুর্গা ভট্টচার্য একদিন এসে হাজির। গঙ্গাচরণ পাঠশালাতে ছেলে পড়াচ্ছে।

—এই যে পশ্চিমমশায়!

গঙ্গাচরণ চমকে গেল। বললে—আসুন, কি ব্যাপার?

—এলাগ।

—ও, কি মনে করে?

—মা ভাল আছেন?

—হঁ।

—সন্তানদি কিছ হোল?

—হয়েচে।

গঙ্গাচরণ এখনও ভাবে, দুর্গা ভট্টচার্যের মন্তলবখানা কি। ভট্টচার্য কি বাড়ী যেতে চাইবে নাকি? কি মর্শকলেই সে পড়েচে। কত বড়লোক আছে দেশে, তাদের বাড়ীতে যা না কেন বাপু। আমি নিজে পাইনে খেতে, কোনো রকমে ছেলে দুটোর আর রোগা বউটার জন্যে দুটি চাল আটা কত কষ্টে যোগাড় করে আনি, ভগবান তা জানেন। থাকে থাকে, এ ভাষা কোথা থেকে এসে জেটে তার মধ্যে।

দুর্গা একটা ছেলেকে উঠিয়ে তার কেরোসিন কাঠের বাসুটার ওপর বসলো, তারপর গলায় উড়ুনখানা গলা থেকে খুলে হাঁটুর ওপর রেখে বললে—একটু জল খাওয়াতে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পটলা, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয় দিকি ঘটিটা মেজে।

—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, বর্লাচ—জলটা খাই। তেঁতায় জিব শুকিয়ে গিয়েচে।

জল পান করে দুর্গা পশ্চিম একটু সুস্থ হয়ে বললে—আঃ!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর দুর্গাই প্রথম বললে—বললে—কড় বিপদে পড়েচি, পশ্চিম মশাই—

—কি?

—এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।

—পাঠশালার চাকরি?

—হ্যাঁ মশাই। হয়েছে কি, আমি আজ নটি বছর কামদেবপুর পাঠশালায় সেকেন পশ্চিম করিচি, মাইনে আগে ছিল সাড়ে তিন টাকা এখন দেয় পাঁচ টাকা। তা মশাই গোয়াল হোল ইস্কুলের সেক্রেটারি। আজ পাঁচ মাস হোল কোথা থেকে এক গোয়ালার ছেলে জুটিয়ে এনে তাকে দিয়েচে চাকরি। সে করলে কি মশাই! দার্জিলিং গেল বেড়াতে। সেখান থেকে এসে উম্মার পাগল হয়ে গেল—

—কেন কেন?

—তা কি করে জানবো মশাই। কোথাকার নাকি ফটোগেরাপ তুলতে গিয়েছিল, সায়েবে কি বাইয়ে দেয়—এই তো শুনতে পাই। মশাই, তুমি পাও পাঁচ টাকা মাইনে, তোমার সেই দার্জিলিং—দার্জিলিং-এ যাওয়ার কি দরকার? সেখানে সায়েব-সুবেদের জায়গা। বাঙালীরা সেখানে গেলে পাগল করে দেয় ওঘুৎ খাইয়ে। সাথে কি আর বলে—

—সে যাক, আসল কথাটা কি সংক্ষেপে বলুন—

—তারপর সে ছোকরা আজ তিন মাস পরে এসে জুড়েছে। এখন আর পাগল নেই, সেরে গিয়েছে। তাকে নেবে বলে আমরা বললে—আপনি এক মাস ছুটির দরখাস্ত করুন—

—আপনি করে দিলেন ?

—দিতে হোল। হেডমাস্টার নিজের আমার টেবিলে এসে বলে—লিখুন দরখাস্ত। লিখলাম। কি আর করি। তখন মঞ্জুর করে দিলে। এখন দেখুন বিপদ। ঘরে নেই চাল, তার ওপর নেই চাকরি। আমি এখন কি করি। বাড়ীসমূহ যে না খেয়ে মরে। তাই ভাবলাম যাই আপনার কাছে। একটা পরামর্শ ন্যান। আর তো কেউ নেই যে তাকে দুঃখের কথা বলি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—দুঃখের কথা একবার ছেড়ে একশো বার বলো। কিন্তু বাড়ী যেতে চাও যদি, তবেই তো আসল মর্শাকিন। দুর্গা ভট্টাচার্যের মতলবখানা যে কি, তা গঙ্গাচরণ ধরতে না পেরে সন্মিষ্ট দৃষ্টিতে ওর মূখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলে দুটির চাল জোটানো যাচ্ছে না, বউটার জন্যে কত কেরেকাকিয়ে এক সের আটা নিয়ে আসা, এই সমস্ত দুর্গা ভট্টাচার্য যদি গিয়ে ঘাড়ে চাপে, তবে গোখে অস্বকার দেখতে হবে যে দেখছি। শ্রীও এমন নিরোধ, যদি ও গিয়ে হাজির হয় আর কাঁদুনি গায় তার সামনে, তবে আর দেখতে হবে না। মূখের ভাত বেড়ে দেবে। নিজের না খেয়ে ঐ বউটাকে খাওয়াবে।

নাঃ, কি বিপদেই সে পড়েছে।

এখন মতলবখানা কি বড়োয় ?

বসে বসে গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

যদি ছুটির পরে দুর্গা ভট্টাচার্য তার সঙ্গে তার বাড়ী যেতে চায়, তবে ?

না, ও চলবে না। একটা কিছু ফন্দি বার না করলে চলবে না। এমন কিসের খাতির দুর্গা ভট্টাচার্যের সঙ্গে যে নিজের শ্রী-পুত্রের মূখ বশিত করে ওকে খেতে দিতে হবে ?

দুর্গা ভট্টাচার্য বলে—ছুটি দেবেন কখন ?

—ছুটি ? এখনও অনেক দেরি।

—সকাল বিকেল করেন, না এক বেলাই ?

—এক বেলা।

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে খাওয়ালে নিজের হাতে দুর্গাকে।

দুর্গা তামাক খেয়ে একমূখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠকোটি গঙ্গাচরণের হাতে নিয়ে বললে—এখন বড় যে বিপদে পড়ে গেলাম। চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সা নেই—আপনার কাছে বলতে কি, আজ দুর্দিন সপরিবারে না খেয়ে খিদের জ্বলায় ছুঁটে এলাম, বলি কোথায় যাই ? আর তো কেউ নেই কোথাও ? না-ঠাকরণ দয়া করেন, মা আমার, অন্নপূমো আমার। তাই—

এর অর্থ সম্পূর্ণ। দুর্গা ভট্টাচার্য বাড়ীই যাবে। সেইজন্যেই এখনো ওঠে নি, বসে বসে তামাক খাচ্ছে। দুর্দিন খাই নি, সে-যখনই আসে, তখনই বলে দুর্দিন খাই নি, তিনদিন খাই নি। কে মশায় তোমাকে রোজ রোজ খাওয়াল—আর এই দুর্দিনে ? লোকের তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত।

কি মতলব ফাঁদা যায় ? বলা যাবে কি ও বাপের বাড়ী গিয়েছে ? কিংবা ওর বন্ড অসুখ ? উঁহ, তাহোলে ও আপদটা সেখানে দেখতে যেতে পারে।

গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভেবে কিছুই পেল না। ছুটির সময় হয়ে এল। পাঠশালার ছুটি

দিয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বাড়ীর দিকে চলবে, ও অর্মান চলবে গঙ্গাচরণের সঙ্গে। সোজাসুজি কণা ন লে কেমন হয়? না মশাই, এবার আর সর্দূবধে হবে না আমার ওখানে। বাড়ীতে অর্মান, তার ওপর চালের টানাটানি।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্যে গঙ্গাচরণ প্রস্তুত ছিল না।

বেলা যত যায় দুর্গা ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে পাঠশালা থেকে নামে আর রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে সেখাটি-মণিরামপুত্রের বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে।

দুর্দিনবার এ রকম করবার পরে গঙ্গাচরণ কৌতুহলের সুরে বললে—কি দেখছেন?

—এত দেরি হচ্ছে কেন, তাই দেখাচি।

—কাদের দেরি হচ্ছে? কারা?

—ওই যে বললাম। বাড়ীর সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে। সব না খেয়ে আছে যে। আর কোনো উপায় তো দ্যাখলাম না। বলি, চলো আমার অন্নপুত্রো মার কাছে। না খেয়ে ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটা বস্তু কাতর হয়ে পড়েছে। দিশেহারা মত হয়ে গিয়েছে মশাই। তা আমি দুটো কলাইসেদ খেলায় মণিরাম-পুত্রের নিধু চক্ৰিকর বাড়ী এসে। তাদেরও সেই অবস্থা। গোয়ালার বামন, এ দুর্দিনে কোনো কাজকর্ম নেই, পায় কোথায় বলুন। চাল একদানা নেই তাদের ঘরে। নিধু চক্ৰিকর বড়ো মা বুঝি জ্বরে ভুগছে আজ দু মাস। ওই ঘুমঘুমবে জ্বর। তারই জন্যে দুটো পুত্রনো চাল যোগাড় করা আছে। তিনি খান। ওরা খেতে বসেছে সিংধকলাই। সব সমান অবস্থা। আমি বলি আমি এগিয়ে গিয়ে বসি পান্ডিত মশায়ের পাঠশালায়, তোমরা এসো।

সর্বনাশের মাথায় পা!

দুর্গা ভট্টাচার্য গুন্টিসমেত এ দুর্দিনে তারই বাড়ী এসে জুটচে তা হলে! মতলব করেছে দেখাচি ভালোই।

এখন উপায়?

সোজাসুজি বলাই ভালো। না কি?

এমন সময়ে রাস্তা থেকে বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল—ও বাবা—

—কে রে, ময়না? বলেই দুর্গা পান্ডিত বাইরে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে পাঠশালার সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে নিয়ে অল্প একটু পরেই দুর্গা পান্ডিত পাঠশালায় ঢুকে বললে—এই আমার মেয়ে ময়না, ভালো নাম হৈমবতী। প্রণাম করো মা—

কি বিষম মূর্শকিল!

হৈমবতী এগিয়ে এনে প্রণাম করলে সলজ্জভাবে। বেশ সুন্দরী মেয়ে। ওই রোগা স্ট্রিকা, দাঁড়ির মত চেহারা দুর্গা ভট্টাচার্যের এমন সুন্দর মেয়ে!

দুর্গা ভট্টাচার্য বললে—ওরা সব কৈ?

হৈমবতী বললে—ওই যে বাবা গা ছতলায় বসে আছে মা আর খোকারা। আমি ওদের কাছে যাই বাবা। বোঁচকা নিয়ে মা হাঁটতে পারচে না।

গঙ্গাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এদের তাড়ানো আর তত সহজ নয়। এরা বোঁচকা-বর্চক নিয়ে আহ্বারের সম্মানে দেশত্যাগ করে যখন রওনাই হয়েছে। বিশেষ করে

—আজ্ঞে, এখানে খাদ্যখাদক মেলেই না—চিঁড়ে ঘরে নেই ঠাকুরমশায়। বড় লজ্জায় ফেললেন—

—না না, লজ্জা কি? তোমাদের এ গ্রামে বাপু এই রকমই কাণ্ড। খাদ্যখাদক কিছুর মেলে না। কদিন থেকে ভাবছি দুটো চিঁড়ে ভাজা খাব। তা এ ষোগাড় করতেই পারলাম না—অথচ আমার গোলার এক পোটি দেড় পোটি ধান ছিল এই সেদিন।

নিধু কাপালী কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এত বড় লোকের সামনে কি লজ্জাতেই সে পড়ে গেল।

দুর্গা বললে—যাক গে। আমসব আছে ঘরে?

—আজ্ঞে না, তাও নেই। ছেলোপলেরা সব বেয়ে ফেলে দিয়েছে।

—পুরনো তেঁতুল?

—আজ্ঞে না।

—বড় অরুচি হয়ে গেছে মূখে কিনা। তাই দুটো চিঁড়ে ভাজা, পুরনো তেঁতুল একটু এই সব মূখে—বুঝলে না? আর মশায়, লড়াই বেখেচ বলে মূখ তো মানবে না? এই চালকুমড়া তোমার?

সামনে গোলার ওপরে চালকুমড়া লতার বড় বড় চালকুমড়া সাদা হয়ে গিয়েছে পেকে। সারি সারি অনেকগুলো আড় হবে আছে গোলার চালে; নিধু কাপালী বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, আমারই।

—নাও একখানা ভাল দেখে। বাড়ি নিতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন—

নিধু হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল এবং একটা বড় পাকা চালকুমড়া পেড়ে নিয়ে এল গোলার চাল থেকে। দুর্গা ভট্টাচার্য সেরি হাতে ঝুলিয়ে গম্ভাচরণের বাড়ীর দিকে রওনা হোল হুস্ট মনে।

অনঙ্গ-বো বললে—ওটা কি হবে জ্যাঠামশাই?

—নিয়ে এলাম মা, আনলেই কাজ দেয়। খাবার জিনিস তো? বাড়ি দিও।

—কলাই খেয়ে প্রাণ বেঁচে আছে, বাড়ি আর কি দিয়ে দেবো জ্যাঠামশাই?

—আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলিচি কাল থেকে।

—না জ্যাঠামশাই, আপনাদের বাড়ী এসেচেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ী চাইতে। যা জোটে তাই খাবো।

—কি জান মা, রাক্ষুণের উপজীবিকা হোল ভিক্ষা। এতে লজ্জা নেই কিছুর। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো। লড়াই বেখেচ বলে পেট মানবে?

—না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি ওতে দরকার নেই।

—আচ্ছা, তুমি চূপ করে থাক। সে ব্যবস্থা হবে।

দুর্গা ভট্টাচার্য গম্ভাচরণকে সম্প্রদায়না বললে—একটা পরামর্শ করি। চাষাগায়ে হেয়ালি-বীর ব্যবসা বেশ চলে। কাল থেকে বেরুবেন? ওদেরই হাতে আজকাল পয়সা।

—সে গাড়ে বালি। আগে চলত, এখন আর চলবে না। চাল ডাল কেউ নিতে পারবে না। পয়সা হয়ত দেবে কিন্তু চাল দেবে কে? কিনবেন কোথায়?

—ধান যদি দায়?

—ওমা সে কি সম্বোনাশ ! হ্যাঁগো কি হবে ওর ? ছুটাকির ?

—ওকে লাখি মেরে ভাড়িয়ে দেবে শখ মিটে গেলে । তখন নাম লেখাতে হবে শহরে গিয়ে, নয়ত জিঙ্ক করতে হবে ।

চতুর্থ দিন অনেক রাতে কে এসে ডাকলে ঘরের বাইরে থেকে—

—ও বামুন-দিদি—

ময়না জেগে উঠে বললে—কে ডাকচে বাইরে, ও দিদি বলে—

সে উঠে দোর খুলে দিতে ছোট-বো ঘরে ঢুকল । পরনে নতুন কোরা লালপেড়ে শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে নতুন কাঁচের চূড়ি ।

অনঙ্গ-বো বিস্ময়ের ও আনন্দের সুরে বললে—কি রে ছোট-বো ?

ছোট-বো মেঝের ওপর বসে পড়ল । একটুখানি চুপ করে থেকে ফিক করে হেনে ফেলল । ময়নার মাও ততক্ষণ উঠেচে । ছোট-বোয়ের কাণ্ড সব শুনছে এ কাঁদিনে । ময়নার মা ছিল কামদেবপুর গায়ে মধ্য সকলের চেয়ে নিরীহ মেয়েমানুষ । কখনো কারো কথায় থাকে না, গরীব ঘরের বো—দুঃখ-ধাম্মার মধ্যে চিরকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করে এসেচে । সে শূন্য চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল । এমন অবস্থায় আবার লোকের মধ্যে হাসি বেরোয় ? ময়নার মা এই কথাই ভাবছিল ।

অনঙ্গ-বো রাগের সুরে বললে—হাসি কিসের ?

ছোট-বো মুখ চুন করে বললে—এমনি ।

—ও পর্টালি কিসের ?

—ওতে চাল । তোমার জ্বান্য এনিচি ।

—ঝাঁটা মারি তোর চালের মাথায় । নিয়ে যা এখন থেকে । আমি কি করবো তোর চাল ?

—রাগ কোরো না বামুন-দিদি, পারে পড়ি । তুমি রাগ কালি আমি কনে যাব ?

এবার ছোট-বোয়ের চোখ দুটো যেন জলে ভরে এল । সত্যিকার চোখের জল ।

অনঙ্গ-বোয়ের মনটা নরম হোল । খানিকটা স্নেহের সুরে বললে—বদমাইশ কোথাকার । ধাড়ি মেয়ে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি কাজ করতে কি কাজ করে বসো তোমার জ্ঞান হয় না ? আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে জবারদিহ করতে হবে সে খেরাল হয় না তোমার ? সতের ঝাঁটা মারি তোমার মাথায় তবে যদি এ রাগ যায় ।

অজ্ঞান পাপীকে ভগবানও বোধ হয় এমনি সন্দেহে অনুরোধের সুরে তিরস্কার করেন । ছোট-বো মুখ চুন করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল ।

এরই মধ্যে একদিন মতি মূর্চিনী অতি অসহায় অবস্থায় এসে পেঁছলো ওদের গায়ে ।

সকালে হাবু এসে বললে—মতি-দিদিকে দেখে এলাম মা, কাপালীদের বাড়ী বসে আছে । ওর চেহারা বড় খারাপ হয়েছে ।

অনঙ্গ-বো বললে—কি রকম দেখে এলি ?

—রোগা মত ।

—জ্বর হয়েছে ?

—তা কি জানি ! দেখে আসবো ?

হাব্দু আবার গেল, কিন্তু মতিকে সেখানে না দেখে ফিরে চলে এল।

আর দু'দিন ওর কথা কারো মনে নেই, একদিন সকালে মতি হাব্দুদের বাড়ীর সামনে একটা আমগাছের তলায় এসে শূয়ে পড়লো। ওর হাত-পা ফুলেছে, মূখ ফুলেছে, হাতে একটা মাটির ভাড়া। সারা দুপুর সেখানে শূয়ে জ্বরে ভুগেছে, কেউ দেখে নি, বিকেলের দিকে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরবার পথে ওকে দেখে কাছে গিয়ে বললে, কে ?

ওকে চিনবার উপায় ছিল না।

মতি অতি কণ্ঠে গোর্গিয়ে গোর্গিয়ে বললে—আমি দাদাঠাকুর—

—কে, মতি ? এখানে কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

—বহু জ্বর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাই নি, দুটো ভাত খাবো।

—তা হয়েছে ভালো। তুই উঠে আয় দিক, পারবি ?

উঠবার সামর্থ্য মতির নেই। গঙ্গাচরণ ওকে ছোঁবে না। সদুতরাং মতি সেখানেই শূয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ শূনেতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্বল। উঠে মতির কাছে বাওয়ার শক্তি তারও নেই।

বললে—ওগো মতিকে কিছন্ন খেতে নিয়ে এসো—

—কি দেবো ?

—দুটো কলাইলের ডাল আছে ভিজানো। এক মূঠো দিয়ে এসো।

—ও খেয়ে কি মরবে ? তার জ্বর আজ কতদিন তা কে জানে। মূখ হাত ফুলে ঢোল হয়েছে। কেন ও খাইয়ে নিমিস্তের ভাগী হবো ?

—তবে কি দেবো খেতে ? কি আছে বাড়ীতে ?

খব্ব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছন্নই ঘরে নেই। কি খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কুছ ঘরে আছে বটে কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। হাব্দু পূর্ব পাড়ার জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই কুছটুকু আজ দু'দিন আগে তুলে এনেছিল, দু'দিন ধরেই এক এক টুকরো সিদ্ধ খেতে খেতে ওই এক ফালি অবশিষ্ট আছে।

ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, কুছ বেটে স্নান দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রুগী খেতে পারে না ?

—তা বোধ হয় পারে, মানকচু ?

—জঙ্গলে মানকচু।

—তা দাও।

সেই অতি তুচ্ছ খাদ্য ও পথ্য একটা কুলার পাতায় মূড়ে হাব্দু মতির সামনে নিয়ে খেল। অনঙ্গ-বৌ অতি যত্ন নিয়ে জিনিসটা তৈরী করে দিয়েছে। হাব্দুকে বলে দিয়েছে ওকে এখানে নিয়ে আসবি, বাইরের ঠৈঠাতে বিচুলি পেতে পদরু করে বিছানা করে দিলেই হবে। আমতলায় শূয়ে থাকলে কি বাঁচে ?

হাব্দু গিয়ে ডাকলে,—ও মতি-দিদি, এটুকু নাও—

মতি ক্ষীণ সুরে বললে—কি ?

—মা খাবার পাঠিয়েচে—

—কে ?

—আমার মা ? আমার নাম হাব্দু, চিনতে পারচো না ?



মতি কথা বলে না—খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হাব্দ আবার বললে—ও মতি-দিদি ?

—কি ?

—খাবার নাও। মা দিয়েচে পাঠিয়ে।

—শালিক পাখী শালিক পাখী, ধানের জাওলায় বাদ—

—ও মতি-দিদি ? ওসব কি বলচো ?

—কে তুমি ?

—আমি হাব্দ। ভাতছালায় আমাদের বাড়ী ছিল, মনে পড়ে ?

—বিবিলর ধারের পদ্মফুল,

নাকের আগেয় মোতির দুল,

—ও রকম বোলো না। খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে।

—কি ?

—এই খাবার খেয়ে নাও—

—কে তুমি ?

—আমি হাব্দ, আমার বাবার নাম পুংগাচরণ চন্দ্রবর্তী, পশ্চিম মশাই ছিলেন, মনে পড়ে না ?

—হঁ।

—তবে এই নাও খাবার। মা পাঠিয়েচে।

—ওখানে রেখে যাও—

—কুকুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি খেয়ে নাও, নিয়ে আমাদের বাড়ী চলো, মা যেতে বলেচে।

—কে তুমি ?

—আমি হাব্দ। আমার বাবার নাম—

মতি আর কথা বললে না। যেন ঘূর্মিয়ে পড়লো। হাব্দ ছেলেমানুষ, আরও দু'তিনবার ডাকাডাকি করে কোনো উত্তর না পেয়ে নে কচু বাটাটুকু ওর শিয়রের কাছে রেখে চলে এলো।

অনুগ-বো বললে—কিরে, মতি কই ? নিয়ে এলি নে ?

—সে ঘূর্মুচ্ছে মা। কি সব কথা বলে, আবোল-তাবোল, আমার তো ভয়ই হয়ে গেল। খাবার রেখে এসেচি তার শিয়রে।

—আর একবার গিয়ে দেখে আসবি একটু পরে।

—বাবাকে একটু যেতে বোলো, বাবা ফিরলে।

—তুই আর একটু পরে গিয়ে খাবারটুকু খাইয়ে আসবি—

আরও কিছুক্ষণ পরে হাব্দ গিয়ে দেখে এল মতি সেইভাবেই মুখ গর্জে পড়ে আছে। উঠলোও না বা ওর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না। কচুবাটা সেইভাবে ওর শিয়রের কাছেই পড়ে। হাব্দ অনেক ডাকাডাকি করলে, ও মতি-দিদি, ও মতি-দিদি—সম্ভ্য হয়ে এল। অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিলে, বোধ হয় জল হবে। হাব্দ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো, বিস্মিতে ভিজবে এখানে বসে থাকলে। মতি-দিদিও এখানে শব্দে থাকলে ভিজবে মরবে। এখন কি করা যায় ?

মাকে এসে ও সব কথা বললে ।

অনঙ্গ-বৌ বললে, ময়নাকে নিয়ে যা, দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে এসে বাইরের পৈঠেতে শাইয়ে রেখে দে—

ময়না হাসিমুখি-প্রিয় চঞ্চলা মেয়ে ।

সে বললে—আমরা আনতে পারবো ? কি জাত কাকীমা ?

—মুঁচি ।

ময়না নাক সিঁটকে বললে—ও মুঁচিকে ছুঁতে গোলাম বই কি এই ডরসম্প বেলা ? আমি পারবো না, আমি না বামুনের মেয়ে ? বলেই হাসতে হাসতে হাবুর সঙ্গে বোঝিয়ে চলে গেল ।

দুজনে গিয়ে দেখলে মতি সেইভাবেই শূয়ে আছে, সেই একই দিকে ফিরে । ওর মাথার শিয়রে সেই কচুবাটা, পাশে একটা মাটির ভাঁড় ।

ময়না গিয়ে ডাকলে, ও মতি—

কোনো সাড়া-শব্দ নেই ।

ময়না হাবুর চেয়ে বয়সে বড়, বদ্বন্দ্বিতা তার আরও একটু পেকেচে, সে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললে, কাকাবাবু বাড়ী থাকেন তো ডেকে নিয়ে আয় দিকি !

হাবু বললে—কেন ?

—আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাবু, একজন কোনো বড় লোককে ডেকে নিয়ে আয় দিকি !

এমন সময়ে দেখা গেল কাপালীদের ছোট-বৌ সে পথে আসচে । ময়না বললে—ও. মাসি, শোনো ইদিকে—

—কি ?

—এসে দেখে যাও, মতি-দিদি কথাবার্তা বলচে না, এমন করে শূয়ে আছে কেন ?

ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাল করে দেখলে ।

মতি মারা গিয়েচে । সে আর উঠে কচুবাটা খাবে না, ভাঁড়েও আর খাবে না জল । তার জীবনের যা কিছু সম্পদ, তা পথের ধারেই ফেলে রেখে সে পরপারে চলে গিয়েচে ।

ছোট-বৌ আর ময়নার মধ্যে সব শূনে অনঙ্গ-বৌ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো ।

গ্রামে থাকা খুব মর্শাকিল হয়ে পড়লো মতি মর্শাকিল মৃত্যু হওয়ার পরে । অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করে নি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে । এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে ? কেউ না কেউ খেতে দেবেই । না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না ।

কিন্তু মতি মর্শাকিলের ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়ে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে । এতদিন যা গম্পে-কাঁহনীতে শোনা যেতো, ভাণ্ড তা সম্ভবের গাঁড়ের মধ্যে এসে পেঁছে গেল । কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না ? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচাতে পারলে না ? সকলের মনে বিষম একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হোল । সবাই তো তাহোলে না খেয়ে মরতে পারে !

দুর্গা ভট্টাচার্য সোদিন দাওয়ায় বসে মতি মূর্চনার মৃত্যুদৃশ্য দেখলে। মনে মনে ভাবলে এবার আমার এতগুলো ছেলেমেয়েকে খেতে দেবে কে? এদের ঘরে তো খাবার নেই, কোনোদিন এক খাঁচি কলাইয়ের ভাল, কোনোদিন বা একটা কুমড়া, তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া। দুর্গা ভট্টাচার্য বড়ো মানুষ, ওর ভাতে পেট ভরে না। পেটে খিদে লেগেই আছে, খিদে কোনদিন ভাঙে না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমন ভাবে আর কদিন এখানে চলবে?

মতির মৃত্যুই আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসছে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজ যা ওর হয়েছে, তা তো সকলেরই হতে পারে! ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।

দুর্গা ভট্টাচার্য বললে—তাই তো ভায়া, এখন কি করা যায়?

গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঘাড়ে বসে থাকে এই বিপদের সময়। শ্রীর ভয়ে কিছ্ বলতেও পারা যায় না।

বিরক্ত সুরে বললে—কি আর করা যাবে, সকলের যা দশা, আমাদেরও তাই হবে—

—না খেয়ে আর কড়া দিনই বা চলবে তাই ভাবি। একটা হিল্লো না হালি ঘাই বা কোথায়?

—একটা হিল্লো কি এখানে বসে হবে, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

অনঙ্গ-বো কাপড়ের ছোট্ট এতটুকু একটা পর্টাল হাতে ওদের দাঁখিয়ে দাঁখিয়ে বললে—এতে কি আছে বলো তো? জ্যাঠামশাই বলুন তো এতে কি?

—কি জান কি?

—এতে আছে শস্যর বীজ, নাউয়ের বীজ আর শাঁকআলুর বীজ। কাপালীদের ছোট্ট বো দিয়ে গিয়েছে। এ পর্টে দেবো আমাদের উঠানে।

গঙ্গাচরণ বললে—সে আশায় এখন বসে থাক। কবে তোমার নাউ শসা ফলবে আর তাই খেয়ে দুঃখ এবার ঘুচবে। সবাইকে মরতে হবে এবার মতির মত।

অনঙ্গ-বো বললে—হ্যাঁগা, মতির দেহটা ওখানে পড়ে থাকবে আর শেমাল কুকুরে খাবে? ওর একটা ব্যবস্থা কর।

—কি ব্যবস্থা হবে?

—ওর জাতের কেউ এ গায়ে নেই?

—থাকলেও কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না মজা।

—না যদি কেউ আসে, চলো আমরা সবাই মিলে মতির সংকার করি গে। ওকে ওভাবে ওখানে পড়ে থাকতে দেবো না। ও বড় ভালবাসতো আমায়। আমারই কাছে মরতে এলো শেষকালে। ভালবাসতো বচ্ছ যে হতভাগী—

অনঙ্গ-বো আঁচলের ভাঁজ দিয়ে চোখ মুছলে।

হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত। অনঙ্গ-বো ছুটফুট করতে মতির মৃতদেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে। কিছ্ তেই ওর মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। তার নিজের যে সে অবস্থা নয়, তাহলে সে আর মরনা দুজনে মিলে মৃতদেহটার সংকার করে আসতো।

দুর্গা ভট্টাচার্য বললে—চলো ভায়া, আমরা দুজনে যাহোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি।  
গঙ্গাচরণ একটু অবাক হয়ে গেল। দুর্গা ভট্টাচার্যের মধ্যে এত পরোপকারের কথা! কিন্তু  
কার মধ্যে কি থাকে বোঝা কি যায়? সত্যিই সে তা করলেও শেষ পর্ষভ! দুর্গা ভট্টাচার্য  
আর গঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট-বো।

আরও দু'দিন কেটে গেল।

শোনা গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক লোক পালাচ্ছে।

রাত্রির মধ্যে অর্ধেক লোক চলে গিয়েছে কাপালীপাড়া থেকে।

কাপালীদের ছোট-বো সকালে এসে জানালে অনঙ্গ-বৌকে, সে চলে যাচ্ছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কোথায় যাবি রে?

—সবাই যেখানে যাচ্ছে—শহরে! সেখানে গেলে গোরমুণ্ডো নাকি খেতে দেচ্ছে।

—কে বললে?

—শোনলাম, সবাই চলেছে।

—কার সঙ্গে যাবি? তোর স্বামী যাবে?

—সে তো বাড়ী নেই। সে আজ দিন পাঁচ-সাত বেগুন বেচতে গিয়েছে শহরের হাটে।

আর আজও তো ফিরল না।

—কোথায় গেল?

—তা কি করে বলবো? তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

—তুই যেতে পারবি নে। আমার কথা শোনা ছুটুকি, তোর অল্প বয়স, নানা বিপদ পথে  
মেরেমানদুবের। আমার কাছে থাক তুই। আমি যদি খেতে পাই তুইও পাবি। আমার  
ছোট বোনের মত থাকবি। যদি না খেয়ে মরি, দুজনেই মরবো।

কাপালী-বো: সাতপাঁচ ভেবে চূপ করে রইল। অনঙ্গ-বৌ বললে—কথা দে, যাবি নে।

—তুমি যখন বলচো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারি নে। তাই হবে।

—যাবি নে তো?

—না। দাঁড়াও দিদি, আমি চট করে এক জায়গা থেকে আসি। এখন আসিচি।

ইটখোলার পাশে অশখতলায় ষদু-পোড়া অপেক্ষা করছে। বেলা আটটার বেশি নয়।  
ওকে দেখে বললে—এই বৃষ্টি তোমার সকাল বেলা? ইটখোলার কুলিদের হাজরে হয়ে গেল,  
বেলা দুপুর হয়েচে। ওবেলা কখন গাড়ী নিয়ে আসব? সন্দের সময়?

ছোট-বো বললে—আনতে হবে না।

ষদু-পোড়া আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললে—আনতে হবে না গাড়ী? তার মানে কি? হেঁটে  
যাবে? পথ তো কম নয়—

ছোট-বো: হাত নেড়ে নেড়ে বেশ ভীষণ করে কৌতুকের সুরে বললে—হটবোও না,  
যাবোও না—

—যাবে না মানে?

—মানে, যাবো না।

ষদু-পোড়া রাগের সুরে বললে—যাবে না তবে আমাকে এমন করে নাচালে কেন?

—বেশ করিচি।

কথা শেষ করেই কাপালী-বো ফিরে চলে আসবার জন্যে উদ্যত হয়েচে সেখে যদু-পোড়া দাঁত খিঁচিয়ে বললে—না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে কাপালী-বো কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।  
 যদু-পোড়া চেঁচিয়ে ডাক দিলে—শুনে যাও, একটা কথা আছে—  
 কাপালী-বো একবার দূর থেকে চেয়ে দেখলে পিছন ফিরে। একটু ইতস্ততঃ করলে তারপর একেবারেই চলে গেল।

### তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

